আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী

অভিজিৎ রায়
www.mukto-mona.com

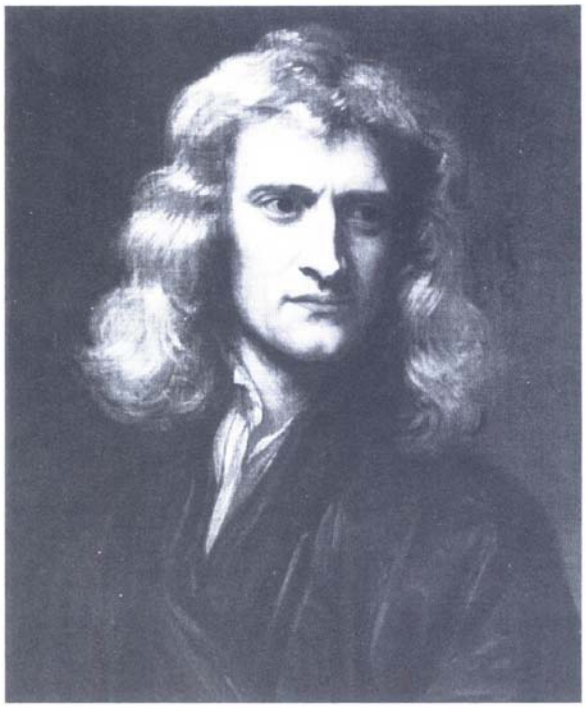

স্যার আইজ্যাক নিউটন

'বলি আমরাও পারতাম' !

'কি পারতাম?' আমি অবাক আমার বন্ধুর 'ইউরেকা' মার্কা চাহনিতে।

'কি আবার? এই মাধ্যাকর্ষণ সূত্র আবিস্কার করে জগৎবাসীকে তাক লাগিয়ে দিতে।'

'তো সমস্যাটা কে করল? তাক লাগাতে মানা করেছিল কে?'

'সমস্যা তো গোড়াতেই। নিউটন সাহেবের (স্যার আইজ্যাক নিউটন) কপাল ভাল। উনি বসেছিলেন তার বাগানে আপেল গাছের নীচে। গাছ থেকে আপেল খসে মাথায় পড়তেই তিনি বুঝেছিলেন মহাকর্ষের কথা। কিন্তু উনি বিলেতে না জন্মে এই বাংলাদেশে জন্মালে তাঁকে বসতে হত আপেল নয় কাঁঠাল গাছের নীচে। মাথায় আপেল পড়া আর কাঁঠাল পড়া তো আর এক কথা নয় রে ভাই! বাঙালী বিজ্ঞানীদের কপালটাই তাই মন্দ!

মাধ্যাকর্ষনের ধারণা মাথায় এলেও বলে যেতে পারেননি কাউকে। দুই মন ওজনের বেমাককা কাঁঠালের আঘাতে অকস্মাৎ মৃত্যু হওয়ায়....

'থাক ! থাম এবার! তুই কি জানিস, নিউটনের এই আপেল মাথায় পড়ার কাহিনীটা একেবারেই বানানো?'

'বানানো মানে?' এবার অবাক হওয়ার পালা আমার বন্ধুটির!

'বানানো মানে, বানানো। স্রেফ বানোয়াট! তোর কি সত্যই মনে হয় নাকি যে তিনি বাগানে বসলেন, মাথায় আপেল পড়ল আর তারপরই মহামতি নিউটনের বোধদয় হল - মার হাবা! নিশ্চয়ই এমন কোন নিয়ম প্রকৃতিতে আছে যার কারণে বস্তু মাটিতে পড়ে! আমার আর তোর মত আহাম্মক তো সবাই!

আসলে আপেল কাঁঠাল কিছু নয়। নিউটন তখন ছিলেন কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ১৬৬৫ সালের দিকে প্লেগ মহামারী হিসেবে দেখা দিলে বিশ্ববিদ্যালয় ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। নিউটনও চলে গিয়েছিলেন তাঁর গাঁয়ে (Woolsthrope) অবসর সময় কাটাতে। সেখানেই মহাকর্ষের ধারণাটি প্রথম তাঁর মাথায় আসে। শুধু মহাকর্ষ নয় এ সময়ই নিউটন প্রিজমের মধ্য দিয়ে আলোর বিচ্ছুরণ সংক্রান্ত নানা পরীক্ষা নিরিক্ষাও করেন। এই সময়টা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, অনেকেই মনে করেন যে প্লেগের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় ছুটি না হয়ে গেলে নিউটন এত কিছু নিয়ে নিবিষ্ট মনে ভাবনা-চিন্তার সময় পেতেন না আর পৃথবীবাসী বঞ্চিত হত তার জাদুকরী কেরামতি থেকে। একেই বোধ হয় বলে কারও সর্বনাশ আর কারও পৌষ মাস !

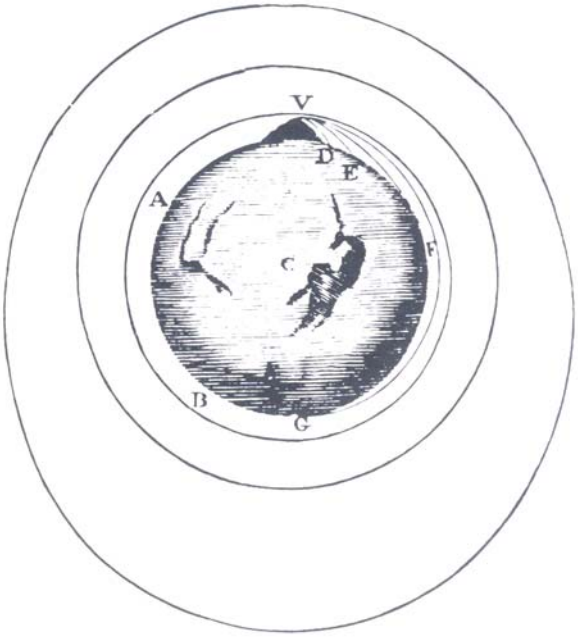

(নিউটনের নিজের হাতে আঁকা স্কেচ। বিভিন্ন গতিতে বস্তুকে পৃথিবী থেকে উপরের দিকে ছুঁড়ে দিলে কি হয় তা বোঝাতে ব্যবহৃত।)

যা হোক, প্লেগ পর্ব মিটে যাওয়ার পর, নিউটন আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলেন; আর ১৬৮৭ সালে 'প্রিন্সিপিয়া' গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি প্রথম বারের মত মহাকর্ষ তত্ত্ব জনসমক্ষে প্রকাশ করলেন। খুবই অবাক ব্যাপার যে, নিউটন প্রায় বিশ বছর ধরে তার এই আবিস্কারের কাহিনী জনসমাজ থেকে গোপন রেখেছিলেন। কেন যে রাখলেন তা আজও একটি রহস্য বটে। শেষ পর্যন্তও বোধ হয় গোপনই রাখতেন, যদি না ১৬৮৪ সালে তার বন্ধু হ্যালির সাথে (যার নামে হ্যালির ধুমকেতু) গ্রহ নক্ষত্রের চালচলন নিয়ে একটি আলোচনায় লিপ্ত না হতেন। সে সময় জ্যোতির্বিদদের জন্য একটি বড় সমস্যা ছিল যে - কেন কেপলারের সূত্রানুযায়ী গ্রহরা চলাফেরা করছে - এর ব্যখা খুঁজে বের করা! নিউটন হ্যালিকে বললেন যে, তিনি এখন থেকে দু'দশক আগেই এই রহস্যের সমাধান করেছেন। তখনই হ্যালি প্রথমবারের মত নিউটনের কাছ থেকে 'মহাকর্ষের' কথা শোনেন। পরবর্তীতে হ্যালির চাপাচাপিতেই নিউটন সম্ভবত পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে লিখিত সবচাইতে influential বইটিতে ('The Mathematical Principles of Natural Philosophy' সংক্ষেপে, 'নিউটনের প্রিন্সিপিয়া') তাঁর ধ্যান-ধারণা তুলে ধরেন। নিউটন বললেন, এই মহাবিশ্বে প্রতিটি বস্তুকণাই একে অপরকে আকর্ষণ করছে। যে কোন দুটি বস্তুকণার কথা যদি ধরা যায়, তা হলে তাদের মধ্যে আকর্ষণের পরিমাণ নির্ভর করবে তাদের ভরের গুনফলের উপর। দুই ভরের গুনফল যত বেশী হবে আকর্ষণ ও সেই অনুপাতে বেশী হবে। আর বস্তু দুটির মধ্যে দুরত্ব যত বাড়বে, আকর্ষণ কমে যাবে তার বর্গের হিসেবে। অর্থাৎ দুরত্ব দুগুন বাড়লে আকর্ষণ হয়ে যাবে চার ভাগের এক ভাগ। দুরত্ব তিন গুন বাড়লে আকর্ষণ হবে ন' ভাগের এক ভাগ। সহজ কথায় এটাই হচ্ছে নিউটনের মহাকর্ষসূত্র।

এ এক আশ্চর্য তত্ত্ব। একদিকে এ দিয়ে আকাশের চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ তারার গতি-প্রকৃতিকে বোঝা যাচ্ছে - জানা যাচ্ছে তাদের অবস্থান, এমন কি পূর্বাভাস দেওয়া যাচ্ছে সূর্যের বা চন্দ্রের গ্রহণের। আবার এই তত্ত্বের সাহায্যেই বোঝা যাচ্ছে পৃথিবীর উপর বিভিন্ন বস্তুর চাল-চলনও - কেনই বা আপেল মাটিতে পড়ে, আর কেনই বা নদীতে জোয়ার ভাটা হয়। আকাশ আর পৃথিবী যে এক নিয়মে বাঁধা নিউটনের আগে এমনি ভাবে আর কেউই বলে যেতে পারেন নি।

নিউটন জন্মেছিলেন সে বছরই যে বছর গ্যালেলিও র মহাপ্রয়াণ ঘটে। আলো হাতে আঁধারের যাত্রীদের কথা বলতে শুরু করলে এ দু মনীষীর কথা অনিবার্য ভাবেই এসে পড়বে।

(চলবে)

২য় পর্ব...

আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী -২

অভিজিৎ রায়
www.mukto-mona.com

প্রথম পর্বের পর হতে...

গ্যালিলিওর কথা শুরু করার আগে প্রথমে এই বিশ্বব্রহ্মান্ডের ব্যাপারে সে সময়কার জ্যোতির্বিদদের ধ্যান-ধারণাগুলো একটু ঝালিয়ে নেওয়া যাক। আসলে পৃথিবী যে গোল এবং গতিশীল, এই ধারণায় পৌঁছাতেই মানুষের সময় লেগেছে বহুদিন। প্রাচীন কালের সাহিত্য আর ধর্মগ্রন্থ গুলো পড়লে বোঝা যায়, সে সময়র মানুষেরা শুধু পৃথিবীকে শুধু সমতলই ভাবত না, ভাবত গতিহীন - স্থির! ভাবত সারা আকাশ এই স্থির পৃথিবীর চারিদিকে ২৪ ঘন্টায় পাক খেয়ে চলেছে। এমনকি থেলসের (৬২৪ -৫৩৭ খ্রী.পূ) মত প্রথিতঃযশা গ্রীক বিজ্ঞানী পর্যন্ত ভাবতেন, পৃথিবী দেখতে অনেকটা সমতল চাকতির মত - জলাদির উপরে ভাসমান কর্ক খন্ড যেন! তবে মানুষ ধীরে ধীরে তার ভুল ধারণা পালটাতে পেরেছে; পেরেছে মহাকাশ নিয়ে তার অনন্ত কৌতুহল আর পর্যবেক্ষণশক্তির কারণেই । যেমন, খুব সহজেই আকাশের দিকে তাকিয়ে বুঝেছে ক্যানোপাস (Canopus) নামে উজ্জ্বল যে তারাটা আলেকজান্দ্রিয়া থেকে দৃশ্যমান, তা কিন্তু এথেনস থেকে মোটেই দেখা যায় না, দিগন্তরেখার উপরে না আসবার কারণে। আবার চন্দ্রগ্রহণের সময় মানুষ খেয়াল করে দেখেছে, চাঁদের উপরে পৃথিবীর যে ছায়া পড়ে তা গোলাকার। এভাবে বিভিন্ন ধরণের পরোক্ষ প্রমাণ পেয়ে 'সমতল পৃথিবীর ভূত' মাথা থেকে অবশেষে সরাতে পেরেছে। তবে গ্রীক দার্শনিকরা সৌরজগতের কেন্দ্রে বসে থাকা 'আপোষহীন পৃথিবীকে' ক্যু করে তখনও নামাতে পারেনি।

আটলাসের কাঁধে বিশ্বব্রহ্মান্ড।
পৃথিবী এর কেন্দ্রে।

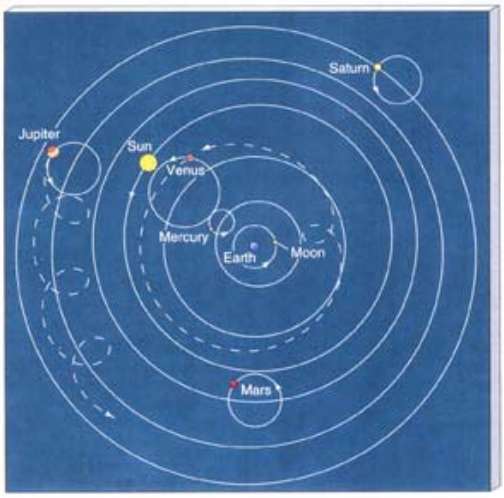

টলেমীর মডেলের একটি সরলীকৃত রূপ

আসলে মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত গ্রীক দার্শনিকদের গুরু অ্যারিস্টটল আর আর গ্রীক-মিশরীয় গনিতবিদ টলেমীর (যিনি দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দের দিকে আলেকজান্দ্রিয়ায় বাস

করতেন) ভূকেন্দ্রিক (Geocentric) মতবাদ পৃথিবীবাসীকে দৃশ্যত সম্মোহিত করে রেখেছিল। দু' জনেই বিশ্বাস করতেন যে পৃথিবী স্থির আর অবস্থান করছে সৌরজগতের কেন্দ্রবিন্দুতে। আর এই পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ক্রমাগত পাক খেয়ে চলেছে সূর্য, চন্দ্র আর অন্যান্য নক্ষত্ররাজি। এই মতবাদ অ্যারিস্টটলের (৩৮৪-৩২২ খ্রী.পূ) পূর্বে প্লেটোও তার ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করেছিলেন। এদের সবারই ধারণা ছিল যে, সূর্য, চন্দ্র সহ সকল মহাজাগতিক বস্তু একটি বৃত্তাকার পথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিন করছে। এ ধরণের ধারণা সূর্য আর চাঁদের গতিপথের ক্ষেত্রে একধরণের ' আপাতঃ সন্তোষজনক' ফলাফল দিলেও গ্রহাদির ঔজ্জ্বল্য আর তাদের অধোগতি কিন্তু কোন ভাবেই ব্যাখ্যা করতে পারছিল না। প্রয়োজন পড়ল আরেকটু জটিল মডেলের। গ্রীক জ্যোতির্বিদ টলেমী ১৪০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে 'সর্বকালের শ্রেষ্ঠ' ভূ-কেন্দ্রিক মডেলের একটি নক্সা প্রণয়ন করলেন। কোপার্নিকাস রংগমঞ্চে আসার আগ পর্যন্ত টলেমীর এই ভুল মডেলটি প্রায় তের শতক ধরে অবলীলায় জন-মানসে রাজত্ব করেছে 'সঠিক মতবাদ' হিসেবে; কারণ সাদা চোখে পাওয়া নিত্যদিনকার 'এভিডেনসের' সাথে টলেমীর মতবাদের কোন আপাতঃ বিরোধ ছিল না।

একটু ভুল হল। কোপার্নিকাসের আগে কেউ যে এই ভূ-কেন্দ্রিক মডেলে কখনও সন্দেহ পোষণ করেনি এই ধারণা কিন্তু ঠিক নয়। যেমন, গ্রীক জ্যোতির্বিদ অ্যারিস্টাকাসের কথা বলা যায়। অ্যারিস্টাকাস (৩১০-২৩০ খ্রী পূঃ) অত্যন্ত সাহসের সাথে অ্যারিস্টটলের মতবাদকে অস্বীকার করে সে সময় বলেছিলেন পৃথিবী এক বছরে সূর্যের চারিদিকে ঘুরে আসে। তিনি এমনকি পৃথিবীর নিজ অক্ষের উপর 'আহ্নিক গতি'র কথাও বলেছিলেন। আকাশ-মন্ডলী আর গ্রহ-নক্ষত্রের চলাচল সম্পর্কিত বহু অনুমানই পরবর্তীতে সঠিক বলে প্রমাণিত হলেও তখনকার সময়ে তাঁর মতবাদ মোটেও জনগণের কাছে সমাদৃত হয় নি। এর কারণও ছিল। অ্যারিস্টাকাস তাঁর বক্তব্যের সপক্ষে কোন গানিতিক প্রমাণ হাজির করতে পারেন নি। আর তা ছাড়া অ্যারিস্টটল ছিলেন সে সময়কার 'মহানবী'। সমাজে তাঁর প্রতিপত্তি ছিল বিশাল, অনুরাগীর সংখ্যাও ছিল বিপুল। অ্যারিস্টটলের বানী সমাজে গৃহীত হত প্রায় 'ঈশ্বরের বাণী' হিসেবে! অ্যারিস্টটলের জনপ্রিয় মতবাদের সাথে পাল্লা দিতে না পেরে অ্যারিস্টাকাসের 'সূর্যকেন্দ্রিক' (Heliocentric) মতবাদ খড়-কুটোর মতই ভেসে গেল।

নিকোলাস কোপার্নিকাস

এই রকম আবস্থা চলছিল প্রায় চৌদ্দ শতক পর্যন্ত যখন প্রথমবারের মত টলেমীর ভূ-কেন্দ্রিক মতবাদ প্রবলভাবে বাঁধার সম্মুখিন হল Mikolaj Kopernic (1473-1543) নামে এক পোলিশ যাজকের কাছ থেকে, যিনি পরবর্তী জীবনে Nicholas Copernicus নামে জনপ্রিয় হন। তাঁর পেশাগত জীবনের শুরুতেই তিনি টলেমীর ভূ-কেন্দ্রিক মতবাদে সন্দেহ প্রকাশ করতে শুরু করেন এবং বুঝতে পারেন টলেমীর মডেলের অনেক সমস্যাই খুব সহজে সমাধান করা যায় যদি পৃথিবীকে সৌরজগতের কেন্দ্র থেকে সরিয়ে সূর্যকে বসানো যায়। পৃথিবী যে সৌরজগতের কেন্দ্র নয়, বরং অন্যান্য গ্রহদের মতই সূর্যকে প্রদক্ষিণরত একটি গ্রহমাত্র - মানব সমাজে এই চিন্তা-চেতনার উত্তোরণকে এখন অভিহিত করা হয়

‘কোপার্নিকাসীয় বিপ্লব’ (Copernician Revolution) হিসেবে।

কোপার্নিকাস কিন্তু তার বিখ্যাত বইটি (De Revolutionibus Orbium Celestum) ১৫৩০ সালে লিখে ফেলার পরও অনেকদিন ধরে ছাপাতে চাননি। কারণ কোপার্নিকাস বুঝতে পেরেছিলেন যে সৌরজগতের কেন্দ্র থেকে সরিয়ে ফেলায় ‘পৃথিবীর বিশিষ্টতা’ যে ক্ষুন্ন হয়েছে তা ধর্মবাদীরা সহজ ভাবে মেনে নেবে না। কোপার্নিকাসের ভয় অমূলক ছিল না। ১৫৪৩ সালে কোপার্নিকাসের বইটি যখন বাজারে বেরোয়, তখন প্রকাশক কোপার্নিকাসের আনুমতি না নিয়েই একটি লাইন যোগ করে দেন এই বলে যে বইয়ের মতবাদটিকে যেন আক্ষরিক ভাবে না নেওয়া হয় - বরং শুধুমাত্র বিচার করা হয় গ্রহ-নক্ষত্রের গতি-প্রকৃতি পরিমাপের সহায়ক একটি পদ্ধতি হিসেবে!

কোপার্নিকাসের বইটি বেরোবার পরও প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে এই বইটি পাঠকসমাজে ‘অনাদৃতই’ থেকে গেল। এই বইয়ের তেমন কোন প্রভাবই তখন জনগনের উপর পরেনি। এর অনেকগুলো কারণ ছিল। প্রথমত বইটির ‘Radical claim’ এবং কারিগরি জটিলতা। আর একটি কারণ ছিল কোপার্নিকাস তাঁর বইটি লিখেছিলেন ল্যাটিন ভাষায়। ল্যাটিন ভাষা তখন শুধু শিক্ষিত জনগোষ্ঠির একাংশের মধ্যে কেতাবী আলোচনার জন্য সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ মানুষেরা এই বইটির স্বাদ থেকে ছিল বঞ্চিত। আসলে কোপার্নিকাসের এই বইটি জনপ্রিয় হয় তার মৃত্যুর আনেক পরে গ্যালিলিওর কল্যাণে। রোমান ক্যাথলিক চার্চ সে সময়ই কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তাদের বিবেচনায় আনেন এবং নিষিদ্ধ ঘোষিত বইয়ের তালিকায় এটিকে লিপিবদ্ধ করেন। পাঠকেরা শুনলে অবাক হবেন যে, কোপার্নিকাসের এই বইটি ‘নিষিদ্ধ পুস্তকের তালিকায়’ (Index of Prohibited books) উঠেছিল ১৬১৬ সালে - বইটির প্রথম প্রকাশের প্রায় ৭৩ বছর পর। আর সেই তালিকায় সেভাবেই ছিল আঠার শতক পর্যন্ত।

গ্যালিলিও র রাজত্বকাল ছিল ১৫৬৪-১৬৪২। রাজত্ব ছাড়া আর কিই বা বলা যায় তাকে! রাজার মতই ছিল তার বিচরণ, যদিও পেশায় ছিলেন গনিতের অধ্যাপক। পড়াতেন পাদুয়া আর পিসায়। কোত্থেকে শুনলেন যে, টেলিসকোপ নামে একটি যন্ত্র কে যেন আবিস্কার করেছে যা দিয়ে মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্র খুব বড় করে দেখা যায়। ব্যাস শোনা মাত্রই (স্রেফ শোনা, দেখা কিন্তু নয়) তিনি নিজেই লেগে গেলেন নিজের জন্য একটা টেলিসকোপ বানাতে। বানিয়েও ফেললেন অবশেষে। এই টেলিসকোপ দিয়েই তিনি চাঁদের পাহাড় দেখলেন, বৃহস্পতির উপগ্রহ দেখলেন। আর সৌর কলঙ্ক আবিস্কার করলেন

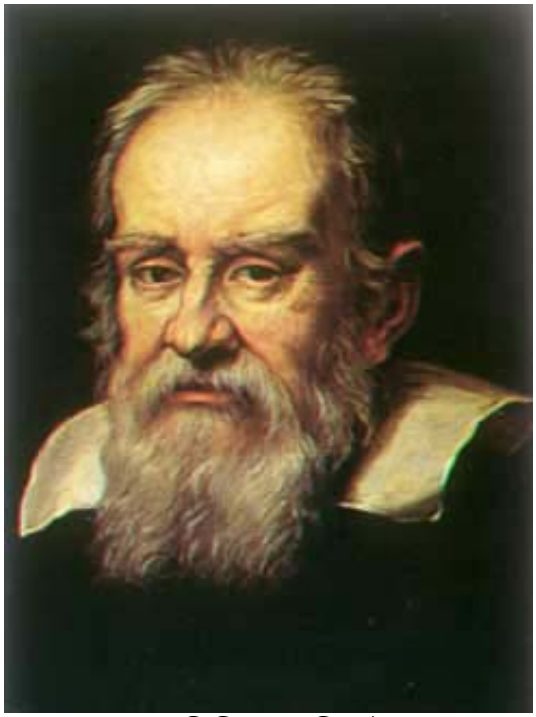

গ্যালিলিও গ্যালিলাই

(সরাসরি এভাবে সূর্যের দিকে অবিরাম তাকিয়ে থাকায় শেষ বয়সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন গ্যালিলিও)। তাকে সবচেয়ে অবাক করল শুক্র গ্রহের চাল চলন। তিনি লক্ষ্য করলেন শুক্র গ্রহ ও আমাদের চাঁদের মতই একটি পূর্ণ চক্রাকাল অতিবাহিত করে, যা কিনা এক ভাবেই শুধু ব্যাখ্যা করা যায় - সূর্য যদি এই সৌরজগতের কেন্দ্রে থাকে। এছাড়া বৃহস্পতি গ্রহের উপগ্রহগুলি যে ভাবে বৃহস্পতির চারিদিকে ঘোরে, তাতে তিনি পরিস্কার বুঝতে পারছিলেন যে, পৃথিবী এই সৌরজগতের কেন্দ্র নয়। মূলতঃ তার এই পর্যবেক্ষনগুলোই পরবর্তীতে কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদের একজন দৃঢ় সমর্থক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে সহায়তা করে।

গ্যালিলিও তার এই পর্যবেক্ষনগুলো ১৬১০ সালে Sidereus Nuncius (The Starry messenger) নামের একটি বইয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। এই বইয়ের 'বিতর্কিত' সিদ্ধান্তগুলো আসলে ছিল কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্বেরই পরোক্ষ সমর্থন। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে টেলিসকোপের মাধ্যমে পাওয়া তার পর্যবেক্ষণ গুলোর মাধ্যমে গ্যালিলিও আসলে সেসময়কার প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণা আর ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছিলেন।

জিওর্দানো ব্রুনো

আক্ষরিক অর্থেই তিনি তখন 'আগুন নিয়ে' খেলছিলেন। নিসন্দেহে তিনি আগুন নিয়ে খেলার ভয়াবহ পরিনাম সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই ভুলে যাননি ক'বছর আগেই ১৬০০ সালে জিওর্দানো ব্রুনো (১৫৪৮-১৬০০) নামে এক জ্যোতির্বিজ্ঞানীকে রোমে কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদকে সমর্থন করার 'অপরাধে' জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। ব্রুনোকে আগুনে পোড়ানোর আগ পর্যন্ত চার্চ থেকে চাপাচাপি করা হয়েছিল যেন তিনি কোপার্নিকাসের ভুল মবাদ পরিত্যাগ করে বাইবেলের বিশ্বাসের সাথে সঙ্গতিপুর্ণ টলেমীর 'পৃথিবী কেন্দ্রিক' মতবাদকে সত্য বলে মেনে নেন।

বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রতি অবিচল ব্রুনো ঘৃণাভরে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখান করলেন। বরং বিচারকদের দিকে তাকিয়ে অবিচলচিত্তে ব্রুনো উচ্চারণ করলেন - 'Perhaps you, my judges, pronounce this sentence against me with greater fear than I receive it." বোঝাই যায়, ব্রুনোর নশ্বর দেহ যখন আগুনের লালচে উত্তাপে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছিল, 'ধর্ম বেঁচে গেল' ভেবে ধর্মবাদীরা কি উদ্বাহু নৃত্যই না করেছিল সেদিন! তারপরও ঈশ্বর আর তার পুত্ররা সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর ঘোরা শেষ পর্যন্ত থামাতে পেরেছিলেন?

যাহোক, গ্যালিলিও খুব উৎসাহ ভরেই তার নতুন আবিস্কারের কথা চারিদিকে প্রচার করতে শুরু করলেন, যা কিনা হয়েছিল তাঁর অ্যারিস্টটলীয় সহকর্মীদের গাত্রদাহের কারণ। অবশেষে ১৬১৬ সালে তার মতবাদকে 'ধর্মবিরুদ্ধ' (heretical) হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়, কোপার্নিকাসের পূর্ববর্তী সমস্ত অবদানকে 'নিষিদ্ধ' করা হয়, এবং গ্যালিলিও কে তার বিশ্বতত্ত্বের প্রচার থেকে বিরত থাকতে আদেশ করা হয়।

গ্যালিলিও কিন্তু বসে ছিলেন না। এসময় গ্যালিলিওর পুরোন বন্ধু এবং তাঁর অনুরাগী Maffeo Barberini নির্বাচিত হন Pope Urban VIII হিসেবে। ফলে গ্যালিলিও আবার তাঁর বিশ্বতত্ত্ব প্রচারে উৎসাহিত হয়ে পরেন। অবশেষে ১৬৩২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে টলেমী আর কোপার্নিকাসের বিশ্বতত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা করে গ্যালিলিও Dialogue Concerning the Two Chief Systems of the World - Ptolemaic and Copernican নামে তাঁর বিখ্যাত বইটি প্রকাশ করেন।

সাধারণ জনগণের কথা মনে রেখে বইটি লেখা হয়েছিল ইতালীয় ভাষায় - খুবই আকর্ষনীয় ভাবে, গ্যালিলিও সৃষ্ট তিন কাল্পনিক চরিত্রের নিজেদের মধ্যে কথোপকথোনের ভিত্তিতে। এই তিন চরিত্রের একজন ছিলেন কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্বের প্রবল সমর্থক - নাম সালভিয়াতি, আরেকজন অ্যারিষ্টটলীয় দার্শনিক যিনি টলেমীর ভূ-কেন্দ্রিক তত্ত্বের সমর্থক - নাম সিম্প্লিসিও, আর তৃতীয়জন (সাগ্রেদো) মোটামুটি নিরপেক্ষ। বইটিতে গ্যালিলিও তাঁর সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্বের প্রতি প্রবল অনুরাগ কিন্তু ঢেকে রাখতে পারেন নি ।

Dialogue Concerning the Two Chief Systems of the World - Ptolemaic and Copernican

ফলে বইটির ছত্রে ছত্রে দেখা যায় কোপার্নিকাসের সমর্থক চরিত্রটির তুখোর যুক্তির কাছে 'নির্বোধ' অ্যারিস্টটলীয় দার্শনিকটিকে বার বার নাজেহাল হতে। ফলে বইটি সাধারণ পাঠকের কাছে আক্ষরিক অর্থেই পৌঁছেছিল সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্বের পক্ষে গ্যালিলিওর একটি কৌশলী প্রচারণা হিসেবে।

এই বইটির মাধ্যমে গ্যালিলিও চার্চের সাথে সরাসরি সংঘাতে জড়িয়ে পড়লেন। ১৬৩৩ সালে চার্চ তাকে পুনরায় অভিযুক্ত করল 'ধর্মদ্রোহিতার' আভিযোগে। গ্যালিলিও তখন প্রায় অন্ধ, বয়সের ভারে নুজ। এই অসুস্থ বৃদ্ধ বিজ্ঞানীকে টেনে হিচড়ে ফ্লোরেনস থেকে রোমে নিয়ে যাওয়া হল, হাটু মুড়ে সবার সামনে বসে জোড় হাতে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলতে বাধ্য করা হল এতদিন গ্যালিলিও যা প্রচার করেছিলেন তা ধর্ম বিরোধী, ভুল, মিথ্যা। বাইবেল যা বলছে সেটাই আসলে সঠিক - পৃথিবী স্থির অনড় -সৌরজগতের

কেন্দ্রে। গ্যালিলিও প্রাণ বাঁচাতে তাই করলেন। শোনা যায়, এর মধ্যেও একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে স্বগতোক্তি করলেন - 'তার পরও কিন্তু পৃথিবী ঠিকই ঘুরছে!' 'ধর্মদ্রোহিতার' আভিযোগ মাথায় নিয়েই গ্যালিলিওর মৃত্যু হয় ১৬৪২ সালে, নিজ গৃহে অন্তরীণ অবস্থায়। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! বুদ্ধিহীন উগ্র ধর্মবাদীদের দল প্রতিটি যুগেই ক্ষমতার শীর্ষে থেকে গেল প্রগতির চাকাকে উলটো দিকে ঘোরাতে।

১৯৯২ সালের ৩১ এ অকটোবর। গ্যালেলিওর মৃত্যুর ৩৫০ বছর পর পোপ জন পল-২ ক্যাথলিক চার্চের পক্ষ থেকে একটি বক্তব্য দিয়ে স্বীকার করে নিলেন যে গ্যালিলিওর প্রতি চার্চের সেসময়কার আচরণ মোটেই সঠিক ছিল না।

৩য় পর্ব...

আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী -৩

অভিজিৎ রায়
www.mukto-mona.com

পাঠকদের অনেকেই ব্যক্তিগত ভাবে ই-মেইল করে এই সিরিজটির প্রতি তাঁদের আগ্রহ আর ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছেন; তাঁদের কথা মনে রেখেই এটিকে এগিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা। আমার লেখা মূলতঃ এ ধরনের বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনায় এখন থেকে সীমাবদ্ধ থাকবে। সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

অভিজিৎ
২৫/৬/২০০৩

পূর্ববর্তী পর্বের পর হতে...

১

নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রে সময়ের কোন উল্লেখ ছিল না। সময়ের ব্যাপারটা আসলে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। মহাকর্ষের টান বুঝবার জন্য নিউটনের সূত্রই যথেষ্ট (প্রথম পর্ব দ্রষ্টব্য), কিন্তু কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, এই টান অনুভব করতে কতটা সময় লাগবে, তা হলেই কিন্তু বিপদ! নিউটনের মহাকর্ষ-সূত্র এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারবে না।

ব্যাপারটা আরেকটু পরিস্কার করা যাক। আমরা জানি যে, পৃথিবী নামের আমাদের এই গ্রহটি অনবরত ঘুরে চলেছে সূর্যের চারদিকে (দ্বিতীয় পর্ব দ্রষ্টব্য)। পৃথিবী থেকে সূর্যের দুরত্বও বিজ্ঞানীরা অংক কষে বের করেছেন - প্রায় ১৫ কোটি কিলোমিটার (খুব সঠিক ভাবে বলতে গেলে অবশ্য ১৪ কোটি ৯৫ লক্ষ ৯৭ হাজার ৮৭০কি. মি)। এখন মনে করা যাক, বিরাট একটা মহাজাগতিক বস্তু এসে হঠাৎ ধাক্কা দিল সূর্যকে। এই ধাক্কার ফলে সূর্য নিজ অবস্থান থেকে বেশ খানিকটা সরে গেল। এর ফলে কি হবে? দূরত্ব বদলে যাওয়ায় মহাকর্ষের টানও যাবে বদলে। তবে প্রশ্ন হল কখন পৃথিবীবাসী জানবে এই 'টান বদলের' খবর? নিউটনের সূত্র কিন্তু বলছে সাথে সাথেই। দূরত্ব বদলে যাওয়ার সাথে সাথেই মহাকর্ষের টান যাবে বদলে আর সেই বার্তা সাথে সাথেই পৌছে যাবে পৃথিবীতে । সমস্যাটা আসলে এখানেই। এই সমস্যার ব্যাপারটা নিউটনের আমলে মোটেই বোঝা যায়নি, কারণ এ প্রশ্নই তখন ওঠেনি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নিউটনের সূত্র দিয়েই দিব্যি কাজ চলে যায়। কিন্তু বিশেষ কিছু পরিস্থিতিতে এসে নিউটনের সূত্র একদম ভেঙ্গে পড়ে। সেই বিশেষ

পরিস্থিতির উদ্ভব হয় কখন? কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক; কৃষ্ণ গহবরের (Black Hole) কাছাকাছি- যখন মাধ্যাকর্ষণ বল প্রচন্ড বেশী হয় - এমনি অবস্থায়, অথবা বস্তু কণা যখন ছুটতে থাকে প্রচন্ড গতিতে -প্রায় আলোর বেগের কাছাকাছি।

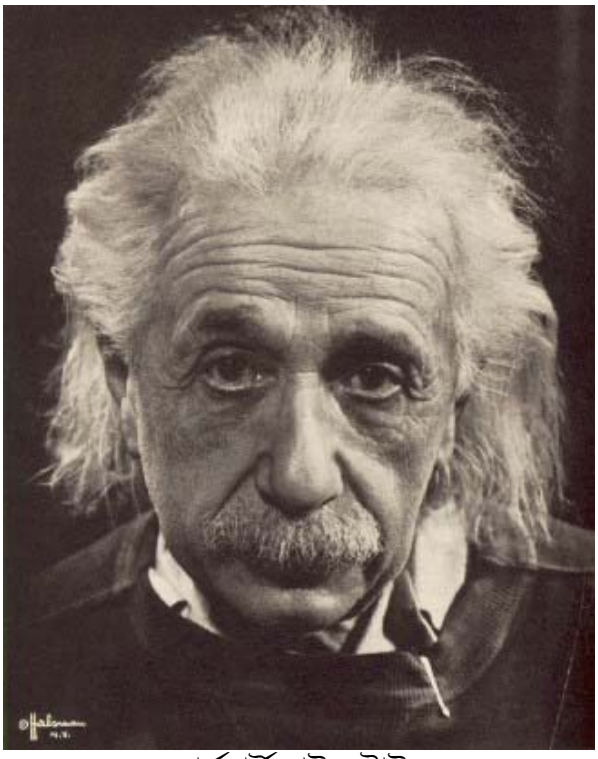

আর্লবার্ট আইনস্টাইন

আলোর বেগ নিয়ে এখানে দু' চার কথা অবশ্যই বলা প্রয়োজন। আলোর বেগ কিন্তু আর দশটা সাধারণ বস্তু কণার বেগের মত নয়। বিশাল সে বেগ। সেকেন্ডে প্রায় তিন লক্ষ কিলোমিটার। ৩০০০ কিলোমিটার রাস্তা পেরুতে বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতগামী ট্রেনেরও লাগবে ১০ ঘন্টার বেশী। এরোপ্লেনের লাগবে অন্তত ৩ ঘন্টা। সেখানে আলোর লাগে ১ সেকেন্ডের ১০০ ভাগের এক ভাগ মাত্র। এই আলো নিয়ে চিন্তা করতে করতেই যুগান্তকারী এক তত্ত্ব দিলেন আইনস্টাইন ১৯০৫ সালে। তত্ত্বটির নাম 'আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব' (Special theory of Relativity)। আইনস্টাইন তখন সবে মাত্র তার পি.এইচ.ডি শেষ করেছেন সুইজারল্যান্ডের জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তিনি তখন বার্ণ এ একটি পেটেন্ট অফিসে তৃতীয় শ্রেনীর কেরানী হিসেবে কর্মরত। এই চাকরীটি এমনিতেই পেয়ে যাননি আইনস্টাইন - পেয়েছিলেন তাঁর এক বন্ধু গ্রসম্যানের (উনার কথা এই প্রবন্ধের শেষদিকে আবার উল্লেখ করা হবে; আইনস্টাইনের জীবনে তাঁর অবদান অসামান্য। আইনস্টাইন তাঁর পি.এইচ.ডি থিসিস এই গ্রসম্যানের নামে উৎসর্গ করেন) বাবার সুপারিশে। এই পেটেন্ট অফিসে কর্মরত থাকা অবস্থাতেই আইনস্টাইন অবসর সময়ে তিনটি যুগান্তকারী পেপার (একটি ফটো-ইলেকট্রিক তত্ত্বের উপর প্লাঙ্কের ধারণাকে সঙ্কলিত করে, আরেকটি আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বের উপর, আর অন্যটি পরিসংখ্যান বলবিদ্যার উপর) প্রকাশ করলেন যা এক ধাক্কায় এই চিরায়ত বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে আমাদের এতদিনকার ধ্যান-ধারণাকে আমূল পালটে দিল।

আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বটি নিয়ে একটু বিষদ আলোচনা করা যাক। এই তত্ত্বের ভিত্তি গড়ে উঠেছে আসলে ১৮৮৭ সালে আমেরিকান দুই পদার্থবিদের (মাইকেলসন এবং মর্লি) পরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত থকে - 'আলোর বেগ তার উৎস বা পর্যবেক্ষকের গতির উপর কখনই নির্ভর করে না; সব সময়ই ধ্রুবক।' ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত। মন মানতে চায় না; কারণ এই ব্যাপারটি বস্তুর বেগ সংক্রান্তআমাদের সাধারণ পর্যবেক্ষনের একেবারেই বিরোধী। যেমন ধরা যাক, আপনি একটি রাস্তায় ৪০ কি.মি বেগে গাড়ী চালাচ্ছেন। আপনার বন্ধু ঠিক বিপরীত দিক থেকে আরেকটি গাড়ী নিয়ে ৪০ কি.মি বেগে আপনার দিকে ধেয়ে এল। আপনার কাছে কিন্তু মনে হবে আপনার বন্ধু আপনার দিকে ছুটে আসছে দ্বিগুন (৪০ + ৪০ = ৮০ কি.মি) বেগে। আলোর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্যরকম। ধরা যাক, একজন পর্যবেক্ষক সেকেন্ডে ১ লক্ষ ৫০ হাজার কিলোমিটার বেগে আলোর উৎসের দিকে ছুটে চলেছে। আর উৎস থেকে আলো ছড়াচ্ছে তার নিজস্ব বেগে - অর্থাৎ সেকেন্ডে প্রায় ৩ লক্ষ কিলোমিটারে। এখন কথা হচ্ছে পর্যবেক্ষকের কাছে আলোর বেগ কত বলে মনে হওয়া উচিৎ? আগের উদাহরন থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতা বলে - সেকেন্ডে (১ লক্ষ ৫০ হাজার + ৩ লক্ষ =) ৪ লক্ষ ৫০ হাজার কিলোমিটার। আসলে কিন্তু তা হবে না। পর্যবেক্ষক আলোকে সেকেন্ডে ৩ লক্ষ কিলোমিটার বেগেই তার দিকে আসতে দেখবে। এটাই মাইকেলসন এবং মর্লির ব্যতিক্রমী পর্যবেক্ষণ - আলোর গতি সব সময়ই একই রকম (ধ্রুবক)।

আইনস্টাইনের এই থিওরী আলোচনা করবার জন্য গনিতের যে জ্ঞান থাকা দরকার হয় তা একেবারেই প্রাথমিক স্তরের। স্কুল কলেজে যারা বীজগনিত পড়ছে তারাও বুঝতে পারবে অংকগুলো। কিন্তু অংক থেকে যে সিদ্ধান্তগুলো (mass increase, length contraction আর time dialation) বেরিয়ে আসে তা সত্যই আশ্চর্য জনক। যদি কোন বস্তু কণার বেগ বাড়তে বাড়তে আলোর গতিবেগের কাছাকাছি চলে আসে, বস্তুটির ভর বেড়ে যাবে নাটকীয় ভাবে (mass increase), দৈর্ঘ্য সঙ্কুচিত হয়ে যাবে (length contraction) এবং সময় ধীরে চলবে (time dialation)। আরেকটা জিনিস বেরিয়ে আসল আইনস্টাইনের তত্ত্ব থেকে। শুন্য পথে আলোর যা গতিবেগ, কোন বস্তুর গতিবেগ যদি তার সমান বা বেশী হয়, তবে সমীকরণগুলো নিরর্থক হয়ে পড়ে। এ থেকে একটা সিদ্ধান্ত করা হয়েছে - কোন পদার্থই আলোর সমান গতিবেগ অর্জন করতে পারবে না। সেই থেকে মহাবিশ্বের গতির সীমা নির্ধারিত হয় আলোর বেগ দিয়ে।

এখন প্রবন্ধের শুরুর সমস্যাটায় আবারো ফিরে যাই। নভোজাগতিক বস্তুর ধাক্কায় সূর্য সরে গেল তার আগের অবস্থান থেকে। নিউটনের সূত্র বলছে পৃথিবীবাসীর তা যেনে যাওয়া উচিৎ পরমুহূর্তেই। কিন্তু আপেক্ষিক তত্ত্ব বলছে আলোর চেয়ে কোন কিছুই তাড়াতাড়ি যেতে পারে না। আলোর বেগেও যদি যাওয়া যায়, তবুও সময় লাগে। মহাকাশে দূরত্বের কথা ভাবলে সময়টা নেহাত ফেলনাও নয়। আলোর গতিতে ১৫ কোটি কিলোমিটার রাস্তা পেরুতে সময় ৮ মিনিটের কিছু বেশী। এ তো গেল সূর্যের কথা। তারাদের মধ্যে যেটি আমাদের সবচেয়ে কাছের, সেই প্রক্সিমা সেন্টরী থেকে আলো আসতে সময় লাগে চার বছরেরও বেশী। অর্থাৎ এই মুহূর্তে যদি কোন কারণে তারাটা ধবংস হয়ে যায়, আমরা তা জানব আজ থেকে চার বছর পর!

নিউটনের সূত্রের সাথে আরেকটি সূত্রের কিন্তু খুব মিল রয়েছে। কুলম্বের সূত্র। ১৭৮০ এর দিকে নিউটনের প্রিন্সিপিয়া প্রকাশের প্রায় শত-বর্ষ পরে শার্ল কুলম্ব দেখালেন, দুটি জিনিসে বৈজ্ঞানিক চার্জ থাকলে তাদের মধ্যে একটা আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল কাজ করবে। মহাকর্ষের মত এখানে একতরফা আকর্ষণ নয়, বিকর্ষণ ও হতে পারে; তবে আকর্ষণ নাকি বিকর্ষণ - তা নির্ভর করবে চার্জ গুলোর ধর্মের (সমধর্মী নাকি বিপরীতধর্মী) উপর। কিন্তু এদের মধ্যে বলের জোর কতটা? কুলম্ব সেখালেন দূরত্ব বাড়ালে এই বল বর্গের অনুপাতে কমে যায়। আর দূরত্ব ঠিক রেখে যদি বাড়ানো হয় চার্জের পরিমান, তবে বলের পরিমানও বাড়তে থাকবে তার গুনফলের অনুপাতে। ঠিক মহাকর্ষের মতই দারাচ্ছে ব্যাপারটা। উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে চুম্বক নিয়ে গবেষনা করতে গিয়ে ফ্যারাডে দেখালেন, কোন একটা জায়গায় যদি চুম্বকের টানের কমা-বাড়া হয় - তাহলে সেখানে একটা বৈদ্যুতিক কারেন্টের সৃষ্টি হয়। এই আবিস্কারের উপর নির্ভর করেই কিন্তু পরবর্তীতে আবিস্কার করা হয়েছিল ডায়নামো বা জেনারেটর। আমরা যদি আজ কুলম্বের যুগেই পড়ে থাকতাম তবে মহাকর্ষ আর আপেক্ষিতত্ত্বের মধ্যকার বিরোধের মত এই সূত্রের বিরোধ নিয়েও মাথা ঘামাতে হত। এই মাথা-ব্যথা থেকে আগেই মুক্তি দিয়ে গেছেন ম্যাক্সওয়েল বলে এক বিজ্ঞানী। তিনি বললেন, বিদ্যুৎ আর চুম্বকের কথা আলাদা করে বললে হবে না, বলতে হবে এক সঙ্গে - তড়িচ্চুম্বক। নিউটনের প্রায় দু'শ বছর পর এভাবে নতুন করে সমন্বয়ের রাস্তা দেখিয়ে ম্যাক্সওয়েল বললেন, ঢেউয়ের মত প্রবাহিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে বিদ্যুৎ আর চুম্বক সংক্রান্ত যাবতীয় সংবাদ।

মহাকর্ষ সূত্রেরও যদি ঠিক একই রকম একটা ভাষ্য পাওয়া যেত, তাহলে আপেক্ষিকতার সাথে বিরোধ থাকত না কখনও। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় এসেও দেখা গেল নিউটনের সূত্র দিয়ে দিব্যি কাজ চালিয়ে নেওয়া যাচ্ছে। আইনস্টাইন নিজেই নামলেন তখন এই বিরোধ মেটানোর কাজে। এবার কিন্তু অংকের ব্যাপারটা আর স্কুল-কলেজ পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রইল না। স্কুল-কলেজ তো অনেক ছোটট ব্যাপার, সে সময় পদার্থ-বিদ্যার উচ্চতম পাঠ নিতে হলে অংকের যে জ্ঞান দরকার - তাতেও কাজ চলল না। আইনস্টাইনকে এর জন্য শিখতে হল এক নতুন ধরনের জ্যামিতি। মার্সেল গ্রসম্যান নামে আইনস্টাইনের এক বন্ধু ছিলেন জুরিখে, অংকের পন্ডিত। তাঁর থেকেই এই নতুন ধরনের জ্যামিতি শিখলেন আইনস্টাইন। আমরা সেই জ্যামিতিকে বাংলায় বলতে পারি 'সমদেশ জ্যামিতি'। কি রকম সেই জ্যামিতি? আর পুরোন জ্যামিতির সাথে তার পার্থক্যইটা বা কোথায়? আসলে স্কুলে আমরা যে জ্যামিতি শিখি তা হল 'ইউক্লিডিয়ান জ্যামিতি' যার অন্য আরেকটা নাম -'সমতল জ্যামিতি'। এই সমতল জ্যামিতিতে কতকগুলো স্বতঃসিদ্ধ রয়েছে। যেমন - ত্রিভুজের তিন কোনের সমষ্টি সব সময়ই ১৮০ ডিগ্রী হবে; দুটি সমান্তরাল রেখা কখনই একসাথে মিলবে না; বৃত্তের পরিসীমা (circumference) পাওয়া যাবে π এবং ডায়ামিটারের গুনফল থেকে; ইত্যাদি। এগুলো সবই আমরা ছোটবেলায় পড়েছি। তবে এই স্বতঃসিদ্ধগুলো গুলো শুধু সমতলের (flat surface) ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সমতলের বদলে বক্রতলে (curved surface) এসে কিন্তু এই ইউক্লিডিয়ান জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধগুলো একদম ভেঙ্গে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে (অর্থাৎ বক্রতলে) কিন্তু দুটি সমান্তরাল রেখা একসাথে মিলে যেতে পারে কিংবা ত্রিভুজের তিন কোনের সমষ্টি ১৮০ ডিগ্রীর চেয়ে কম বা বেশী হতে পারে। নীচের ছবিটা দেখলে হয়ত পাঠকদের কাছে ব্যাপারটা আরও পরিস্কার হবে ।

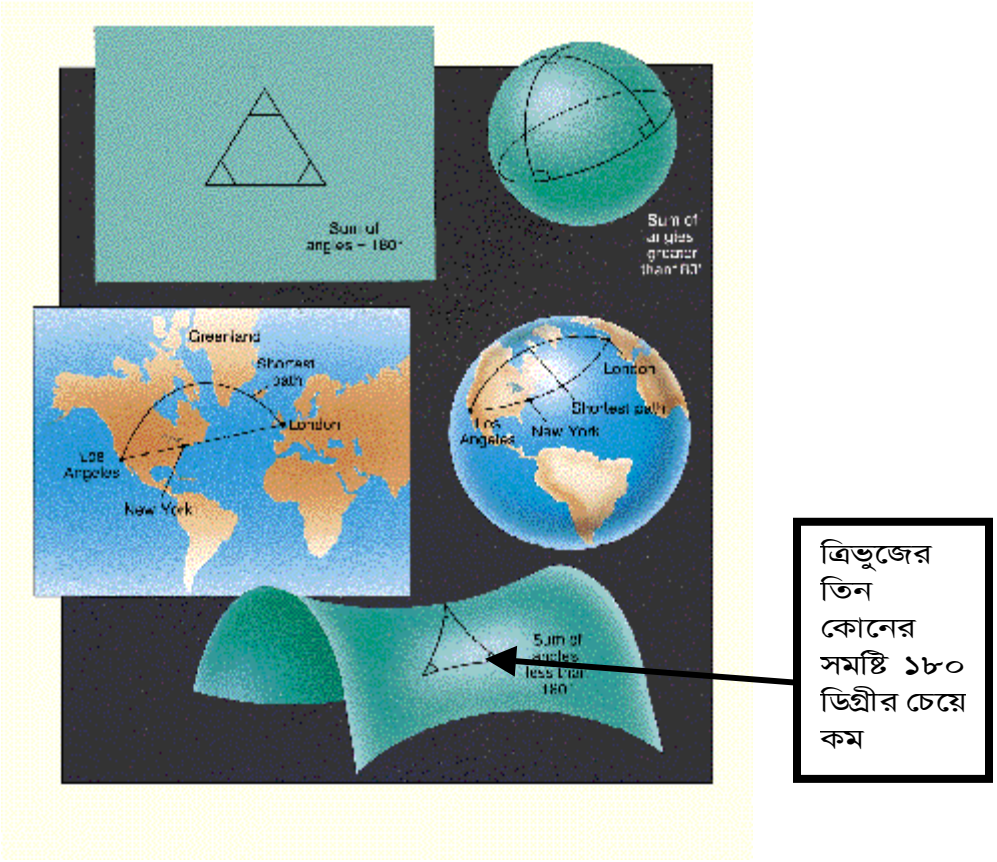

সমদেশ জ্যামিতির উদাহরণ

আইনস্টাইন এই সমদেশ জ্যামিতি গ্রসম্যানের কাছ থেকে শিখে অবশেষে মহাকর্ষের এক নতুন তত্ত্ব দিলেন -১৯১৫ সালে। যে তত্ত্বের সাহায্যে মহাকর্ষের সাথে আপেক্ষিকতাকে সন্নিবদ্ধ করলেন আইনস্টাইন তাকে বলা হল 'আপেক্ষিকতার ব্যাপক তত্ত্ব' (General Theory of Relativity)। আইনস্টাইন দেখালেন যে, মহাকর্ষকে শুধু শুন্যস্থানে দুটি বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ বল (নিউটন যেভাবে চিন্তা করেছিলেন) হিসেবে ভাবলে চলবে না, ভাবতে হবে আপাতঃ শক্তি (aparent force) হিসেবে যার উদ্ভব হয় আসলে মহাশুন্যের (space) নিজস্ব বক্রতার কারণে। মহাশুন্যের এই বক্রতাকে বুঝবার জন্য মহাশুন্যকে একটা পাতলা রাবারের আচ্ছাদনে (rubber sheet) তৈরী টেবিলের উপরিভাগের সাথে তুলনা করা যেতে পারে (সহজ কথায়, আপনার ঘরের টেবিলের উপরটা কাঠ নয়, পাতলা রাবারের তৈরী বলে এ মুহূর্তে ভেবে নিন)। সাধারণ (ভরহীন) অবস্থায় একটি বস্তুকণা গতিশীল হলে এই আচ্ছাদনের উপর দিয়ে সরল রেখাতেই চলবে। কিন্তু একটা ওজনদার বস্তুকে (ধরা যাক একটা ভারী পাথরখণ্ড) যদি আচ্ছাদনের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, তবে সেই রবারের আচ্ছাদনটির আকার বিকৃত হয়ে যাবে -বেঁকে যাবে অনেকটা নীচের ছবির মত।

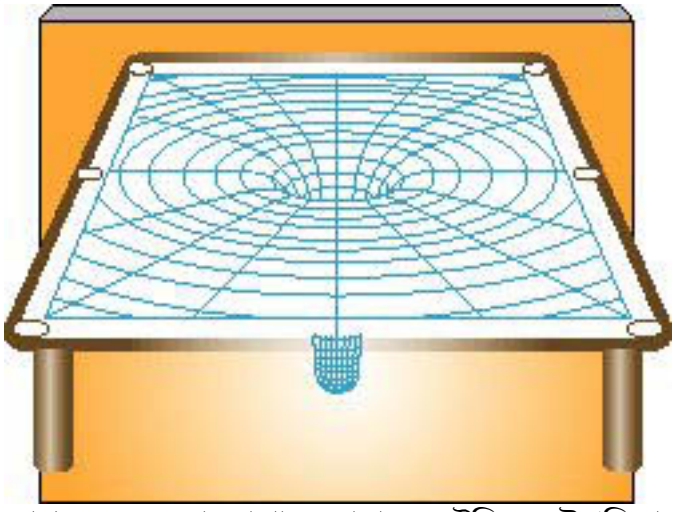

মহাশূন্যের বক্রতা বোঝাতে রাবারের টেবিলের উপরিভাগ

যত ভারী পাথর চাপানো হবে, বক্রতাও বেড়ে যাবে সেই অনুপাতে। এখন কোন বস্তুকণা কে আচ্ছাদনের উপর ছেড়ে দিলে এর চলার পথও কিন্তু বেঁকে যাবে আচ্ছাদনের উপরিভাগের এই বক্রতার কারণে। এই তত্ত্বের আবেদন কিন্তু সুদূর-প্রসারী। বিশাল ভরের কারণে একই ভাবে মহাশুন্যে সৃষ্টি হয় বক্রতা যা কোন বস্তুকণার গতিপথকে - এমনকি আলোর গতিপথকেও বাঁকিয়ে দেয়। আমাদের সৌরজগতের কেন্দ্রে সূর্য থাকার কারণেও কিন্তু সৃষ্টি হয়েছে বক্রতা যার কারণে পৃথিবী সহ অন্যান্য গ্রহগুলোকে একটি বক্রতলে সূর্যের চারদিকে ঘুরতে দেখা যায়। প্রফেসর আর্কিবালড হুইলারের ভাষায় -'পদার্থ স্পেসকে বলছে কিভাবে বাঁকতে হবে, আর স্পেস পদার্থকে বলছে কিভাবে চলতে হবে'! এটাই আসলে নিউটনের মহাকর্ষকে আইনস্টাইনের চোখ দিয়ে দেখা।

তাহলে 'আপেক্ষিকতার ব্যাপক তত্ত্ব' থেকে আমরা জানলাম - সবকিছুই এমনকি আলোও মহাশুন্যের এই বক্রতার (মহাকর্ষের) কারণে প্রভাবিত হয়। ১৯১৫ সালে তাঁর তত্ত্বটি প্রকাশ করার পর পরই আইনস্টাইন বললেন, সূর্যের কাছাকাছি কোন তারা থেকে আলো পৃথিবীতে আসার সময় সূর্যের আকর্ষণের কারণে বেঁকে যাওয়ার কথা। ঠিক কতখানি বাঁকবে তাও আইনস্টাইন গণনা করে দেখালেন - ১.৭৫ ডিগ্রী। খুবই ছোট- কিন্তু পরিমাপযোগ্য তো বটেই। কিন্তু সমস্যাটা হল, আইনস্টাইনের কথা ঠিক কিনা তা বোঝা যাচ্ছিল না তখন। এর কারণও আছে। সাধারণ অবস্থায় সূর্যের কাছাকাছি কোন তারা খুঁজে বের করাই মুশকিল। সূর্যগ্রহণের সময়, যখন চাঁদের ছায়ায় সূর্য ঢেকে যায়, তখনই কেবলমাত্র এধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর পর্যবেক্ষণ করে সত্য-মিথ্যা বের করা সম্ভব। তাই করা হল। ১৯১৯ সালের ২৯শে মে স্যার আর্থার এডিংটনের নেতৃত্বে এক দল জ্যোতির্বিদ সূর্যগ্রহনের সময় তারার আলোর এই বিক্ষেপণ পরিমাপ করলেন ব্রাজিলে। ফলাফল কিন্তু আইনস্টাইনের ভবিষ্যদ্বানীর সাথে অবিকল মিলে গেল!

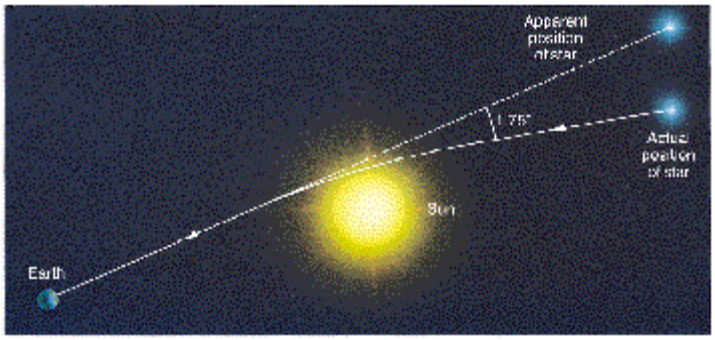

আপেক্ষিকতার ব্যাপক তত্ত্বের পরীক্ষা

রাতারাতি আইনস্টাইন পৌঁছে গেলেন খ্যাতির শিখরে। তার পূর্ববর্তী সকল অবদানের কথা মনে রেখেও বলা যায় - এই একটি মাত্র ভবিষ্যদ্বানীর সাফল্য তাকে তখনকার সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর আসনে পাকাপোক্তভাবে বসিয়ে দিল! ১৯২১ সালে আইনস্টাইন পদার্থবিজ্ঞানে তার অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন - তবে আপেক্ষিক তত্ত্বের জন্য নয়, তার photoelectric effect (১৯০৫) এ অবদানের জন্য।

তাহলে মহাকর্ষ নিয়ে কোন বিরোধটা মিটালেন আইনস্টাইন? আসলে ঠিক বিরোধ নয়, বলা যায় - নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রকে আপেক্ষিকতত্ত্বের মাধ্যমে আইনস্টাইন আরও ব্যাপকতা দিলেন। যখন বস্তুর গতিবেগ থাকে অল্প, অথবা মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব থাকে সামান্য, তখন আসলে নিউটন এবং আইনস্টাইনের তত্ত্ব একই রকম ফলাফলই দেয়। কোন বিরোধ থাকে না। তবে বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে - যেমন সূর্যের কাছাকাছি অবস্থিত তারার আলোর বিক্ষেপণ (উপরে বর্ণিত) নিউটনের সূত্র দিয়ে মোটেই ব্যাখ্যা করা যায় না, যা আপেক্ষিক তত্ত্বের মাধ্যমে খুব সহজেই করা যাচ্ছে। আবার, বুধ গ্রহের কক্ষপথ নির্ণয়ে নিউটনের সূত্র বরাবরই কিছুটা ভুল ফলাফল দিচ্ছিল যার ফলে বিজ্ঞানীরা সূর্য আর বুধের মাঝে আরেকটি গ্রহের অবস্থান কল্পনা করছিলেন (এমনকি এই অদৃশ্য গ্রহটির নামও দেওয়া হয়েছিল - 'ভালকান')। পরবর্তীতে আইনস্টাইনের সূত্রের সাহায্যেই বিজ্ঞানীরা সঠিকভাবে বুধ গ্রহের কক্ষপথ নির্ণয় করেছিলেন। ভালকানকে কল্পনা করার আর কোন প্রয়োজন রইল না।

বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা কি এখন ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠছে? কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক বিপ্লবের পর গ্যলিলিওর নভোজাগতিক বস্তুনিয়ে গবেষণা আর তাঁর পর্যবেক্ষণ গুলো পরবর্তীতে নিউটনের গ্রহ-নক্ষত্রের গতিপথ নিয়ে চিন্তা ভাবনার পথ সুগম করে দেয়। নিউটন মহাকর্ষ সূত্রের সাহায্যে দেখালেন - মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুকণাই প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে চলে। আর আইনস্টাইন এসে এই মহাকর্ষকে ব্যাখ্যা করেলন সম্পুর্ন নতুন ভাবে - মহাশুন্যের বক্রতা (bent time-space) দিয়ে। বললেন, মহাশুন্য রাবারের প্লেটের মতই বেঁকে যায়- যার প্রভাব থেকে আলোও মুক্তি পায় না। ১৯১৯ সালে এডিংটনের পরীক্ষা আইনস্টাইনের তত্ত্বেরই সত্যতা প্রমাণ করল। এখানেই শেষ নয় - আইনস্টাইনের এই আপেক্ষিক তত্ত্বই পরবর্তীতে কৃষ্ণ গহবরের অস্তিত্ব আর মহাবিশ্বের প্রসারণকে সঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করেছিল। উন্মোচিত হয়েছিল রহস্যের আর এক আকর্ষনীয় অধ্যায়।

চতুর্থ পর্ব...

আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী -৪

অভিজিৎ রায়
www.mukto-mona.com

পাঠকদের অনেকেই ব্যক্তিগত ভাবে ই-মেইল করে এই সিরিজটির প্রতি তাঁদের আগ্রহ আর ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছেন; তাঁদের কথা মনে রেখেই এটিকে এগিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা। সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

অভিজিৎ
৯/৭/২০০৩

পূর্ববর্তী পর্বের পর হতে...

অ্যারিস্টটলের ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে একটি সঠিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমাদের বিশ্বজগৎ কে দেখবার ব্যাপারে চিন্তা ভাবনার উত্তোরণ ঘটাতে আক্ষরিক অর্থেই মানুষের হাজার বছর সময় লেগেছে। তারপর থেকে মহাকাশ নিয়ে অন্তহীন কৌতুহল তো মানুষের কমেনি - বরং বেড়েই চলেছে ক্রমাগত। ১৯২০ থেকে ১৯৩০ - এই দশকটা পদার্থবিদ আর জ্যোতির্পদার্থবিদদের জন্য স্বর্ণ-দশক বলা যেতে পারে। তাঁদের হাত দিয়েই মূলতঃ এই সময় পদার্থবিদ্যার এক নতুন শাখা -কোয়ান্টাম বল-বিদ্যার জন্ম হয় । আর আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বপ্রকাশের পর থেকেই জ্যোতির্পদার্থবিদের মধ্যে প্রকৃতি আর মহাকাশকে নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করার যে সাড়া পড়ে গিয়েছিল, তারই ফলশ্রুতিতে তাঁদের মনে উঠে আসছিল - 'কত বড় আমাদের এই বিশ্ব জগৎ? এর বয়সই বা কত?'; 'কিভাবে তৈরী হয়েছিল বিশ্বব্রহ্মান্ডের প্রাথমিক উপাদান গুলো?', 'কি ভাবে পদার্থ সমূহ এই মহাবিশ্বে ছড়ানো?'; আর 'শেষ পর্যন্ত এই মহাবিশ্বের পরিনতিই বা কি হবে?'- এ ধরনের আকর্ষনীয় অথচ অন্তিম প্রশ্ন গুলো। আসলে এই প্রশ্ন গুলো যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে - তার কেন্দ্রে রয়েছে আমাদের এই প্রসারমাণ বিশ্বের (Expanding Universe) ধারণা। ব্যাপারটিকে ভাল মত আত্মস্থ করলেই কেবল অন্তিম প্রশ্নগুলোকে বুঝবার মত পরিস্থিতিতে যাওয়া সম্ভব।

মহাবিশ্বের প্রসারণ নিয়ে কথা শুরু করবার আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে পাঠকদের অবহিত করা প্রয়োজন। পদার্থবিদ্যার স্বর্ণযুগ বলে যে সময়টাকে অভিহিত করেছি সে সময়টাতে শুধু পশ্চিমা বিজ্ঞানীরাই অবদান রেখেছেন তা কিন্তু নয়। ভারতবর্ষের বিজ্ঞানীরাও তখন পিছিয়ে ছিলেন না। অন্ততঃ চারটি অবদানের কথা তো বলাই যায় নির্দ্বিধায়- ১) সাহা আয়নীকরণ সূত্র (Saha Ionization Formula in 1920) ২) বোস সংখ্যায়ন (Bose Statistics in 1924) ৩) রমনের ফলাফল (Raman effect in 1928) এবং ৪) চন্দ্রশেখরের সীমা (Chandrashekhar's limit in 1934/35)। এর মধ্যে প্রথম দুজন (মেঘনাদ সাহা এবং সত্যেন বোস) ছিলেন বাঙ্গালী। মেঘনাদ সাহা জন্মেছিলেন বাংলাদেশেই - ঢাকার অদুরে শ্যাওরাতলি গ্রামে। পড়ালেখাও করেছেন বাংলাদেশের গ্রামের স্কুলেই। পড়ালেখার পাশাপাশি ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনেও ছিলেন সবসময় সমান সক্রিয়; ছিলেন মুক্তচিন্তা এবং যুক্তিবাদের আমরণ পৃষ্ঠপোষক। আর সত্যেন বোস - কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় তাঁর যে বিখ্যাত অবদান - সেই 'বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন' - তা কিন্তু তিনি চিন্তা করে বের করেছিলেন বাংলাদেশে বসেই - ১৯২৪ সালে যখন তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। আজ আমরা যে 'বোসন কণার' নাম শুনি তা কিন্তু পরবর্তীতে এই সত্যেন বোসের নামানুসারেই রাখা হয়েছে হয়েছিল। মূলতঃ সাহা, বোস আর রমণের আবিস্কার তিনটির সূত্রপাত ঘটেছিল আমাদের উপমহাদেশের মাটিতেই। আর চতুর্থ আবিস্কারটি চন্দ্রশেখরের - ইংল্যান্ডের মাটিতে। চন্দ্রশেখরের আবিস্কারটি সম্বন্ধে এখানে সঙ্গত কারণেই একটু বিস্তারিত আলোচনা করব কারণ আমাদের প্রবন্ধের পরবর্তী অংশের সাথে এর ঘনিষ্ট যোগাযোগ রয়েছে।

সুব্রামনিয়াম চন্দ্রশেখর (১৯১০-১৯৯৪)

চন্দ্রশেখর যখন কেমব্রিজে পি.এইচ.ডি করছিলেন সেসময় ইউরোপ আর আমেরিকার বিজ্ঞানীরা তারার উৎপত্তি আর বিনাশ নিয়ে নানা ধরনের গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এ নিয়ে কিছু কথা বলা যাক। একটি তারা যখন তার জীবনকালের প্রান্তসীমায় এসে পৌঁছায়, তখন এর অভ্যন্তরের তাপমাত্রা হঠাৎ বাড়তে থাকে অবিশ্বাস্য গতিতে। এই তাপমাত্রার প্রভাবে অব্যবহৃত হাইড্রোজেন পরিবর্তিত হয়ে হিলিয়ামে পরিণত হয়।

অবশেষে অভ্যন্তরের তাপমাত্রা যখন প্রায় ১০ কোটি ডিগ্রী কেলভিনে পৌঁছায়, তখন নতুন এক ধরনের ফিউশন প্রক্রিয়া চালু হয়ে তা হিলিয়াম পরমানুর নিউক্লিয়াসকে ভেঙ্গে কার্বনে পরিনত করে। এই পুরো প্রক্রিয়াকে বলে 'ট্রিপল-আলফা' বিক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি তারা আয়তনে বৃদ্ধি পেয়ে পরিনত হয় লোহিত দৈত্যে (Red Giant)। আমাদের সূর্য ও প্রায় এক হাজার কোটি বছর পরে এমনি একটি লোহিত দৈত্যে পরিনত হবে। যখন এরকম একটি তারার সমস্ত জ্বালানী নিঃশেষিত হয়ে আসে, নিজস্ব ভরের কারণে সৃষ্ট মাধ্যাকর্ষনের প্রভাবে সেটি তখন প্রবলভাবে সঙ্কুচিত হতে শুরু করে। অবশেষে এর আকার ছোট হয়ে আমাদের পৃথিবীর সমান আকারের তারায় পরিণত হয়, কিন্তু এর ঘনত্ব বেড়ে দারায় প্রায় একশ কোটি কিলোগ্রাম পার ঘন মিটারের মতন। তারার এই পরিনতিকে বলে শ্বেতবামন (White Dwarf)। সাধারণ তারার সাথে শ্বেত বামনের পার্থক্যটা হল সাধারণ তারার ভর বাড়ার সাথে সাথে এটি আয়তনেও বাড়তে থাকে, কিন্তু শ্বেত বামনদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা উলটা। ভর বাড়ার সাথে সাথে এটি না বেড়ে বরং আরও সংকুচিত হতে থাকে। নীচের ছবিটা দেখলে হয়ত পাঠকদের কাছে ব্যাপারটা পরিস্কার হবে। লক্ষ্যনীয় যে, ভর বাড়তে বাড়তে এমন পরিস্থিতি আসতে পারে যখন তারার ব্যাসার্ধ (আয়তন) কমে আক্ষরিক অর্থেই শুন্য হয়ে যায়।

Mass–Radius Relation for White Dwarfs

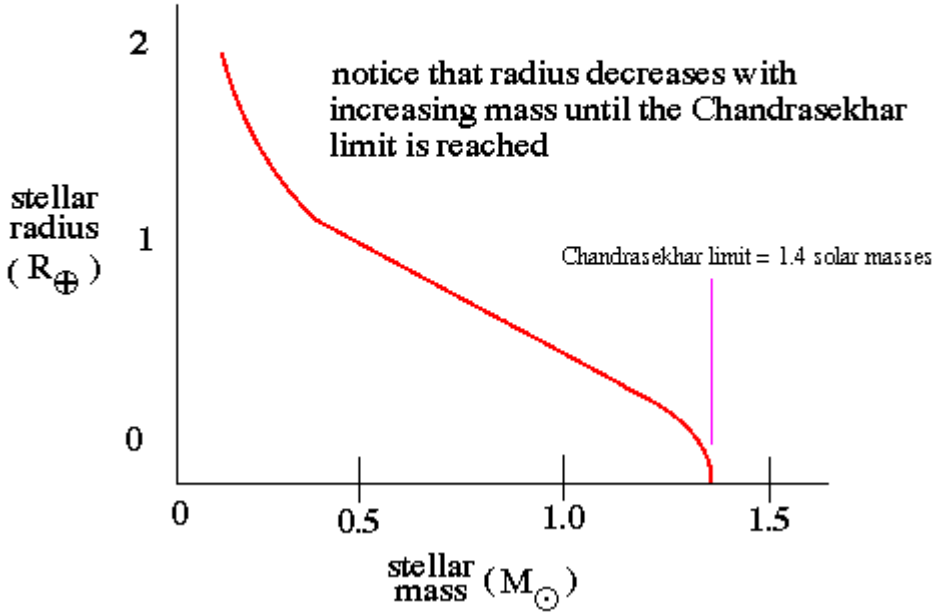

আসলে ১৯৩০ সালের আগে অধিকাংশ বিজ্ঞানীদেরই ধারণা ছিল, সব তারাই বোধ হয় এমনি ভাবে শেষ পর্যন্ত জ্বালানী নিঃশেষ করে শ্বেত বামনে রূপ নেয়। কিন্তু চন্দ্রশেখর বললেন - না, সব তারা নয়। যে সমস্ত তারার ভর সূর্যের ১.১৪ গুনের (এটাই বিখ্যাত চন্দ্রশেখরের সীমা) বেশী, তারা কিন্তু কখনই ওইরকমভাবে শ্বেত বামনে পরিনত হবে না । এ ধরনের তারারা যখন জ্বালানী নিঃশেষ করে তাদের জীবনকালের প্রান্ত সীমায় এসে পৌঁছায়, তখন ভয়ঙ্কর এক সুপারনোভা বিস্ফোরণের মাধ্যমে বাইরের স্তরটি ভেঙ্গেচুরে মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়ে আর ভিতরটা সংকুচিত হয়ে একসময় শ্বেত বামনের চেয়েও ঘন এক ধরনের বস্তুতে পরিনত হয় -যাকে বলা হয় 'নিউট্রন তারা'। সত্যি বলতে কি, সূর্যের চেয়ে ১.১৪ গুন বড় সব তারাই যে এরকম নিউট্রন তারায় পরিনত হয় তাও নয়। এরও একটা সীমা আছে। বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন যে, যে সমস্ত তারারা সূর্যের চেয়ে ১.১৪ থেকে ৩ গুন ভারী, শুধু সে সমস্ত তারাই কেবল নিউট্রন তারায় পরিনত হয়, কিন্তু এর চাইতে ভারী তারারা প্রচন্ড মাধ্যাকর্ষনের টানে ভেঙ্গে পড়তে পড়তে এমন অবস্থায় চলে আসে যখন এর ঘনত্ব হয়ে যায় অসীম; এমনই ঘন যে এর মাধ্যাকর্ষন শক্তিকে উপেক্ষা করে আলো পর্যন্ত পালাতে পারে না। আলো প্রতিফলিত না হওয়ায় আক্ষরিক অর্থেই এই নভোজাগতিক বস্তুগুলো আমাদের চোখে থেকে যায় অদৃশ্য। এরাই কিন্তু বহুল প্রচারিত 'কৃষ্ণ গহবর' বা Black Hole।

এই তত্ত্বকথা গুলো বিজ্ঞানীদের জানা ছিল অনেক আগে থেকেই। তবে এই তত্ত্ব কথার প্রমাণ পেতে সময় লেগেছে। ১৯৬৭ সালে জোসলিন বেল আর অ্যান্টনী হিউয়িশ মহাকাশে খুঁজে পেলেন এক নতুন ধরনের তারা। সাধারণ তারাদের মূল উপাদান হল ইলেকট্রন, প্রোটন আর নিউট্রন। কিন্তু নতুন এ তারাদের পুরোটাই ছিল নিউট্রন। তাই এরা নিউট্রন তারা।

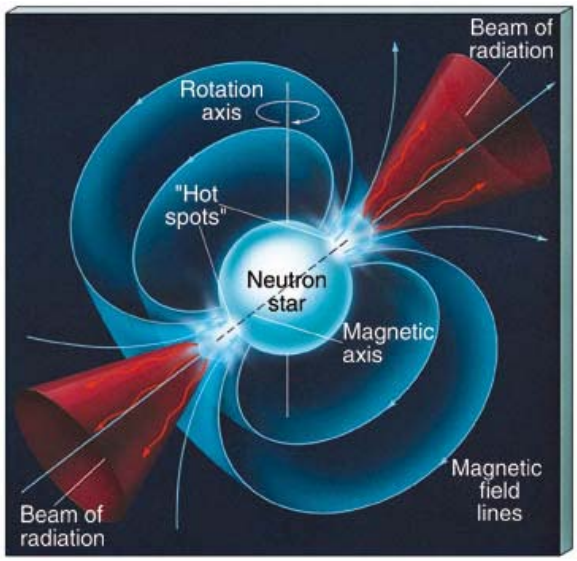

নিউট্রন তারা (লাইট হাউজ মডেল)

নিউট্রন তারার অস্তিত্বের তত্ত্বকথাগুলো তো তাদের আগেই জানা ছিলই। কাজেই বুঝতে তেমন অসুবিধা হল না। কিন্তু কথা হচ্ছে - এই দু'বিজ্ঞানী তারার খোঁজটা পেলেন কিভাবে? পাওয়াটা কষ্টকর, কারণ আমরা তো আগেই জেনেছি যে, নিউট্রন তারা হচ্ছে তারার প্রায় অন্তিম দশা - একেবারে যাকে বলে জরাগ্রস্ত দশা। এই জরাগ্রস্ত তারা থেকে আলো বেরোয় না বললেই চলে। তাহলে? আলো না বেরুলেও আরেকটা জিনিস বেরোয় - লম্বা মাপের ঢেউ - রেডিও তরংগ।

জোসলিন বেল
(১৯৪৩-)

এই রেডিও তরংগ সনাক্ত করেই করেই নিউট্রন তারাদের হদিস পেলেন হিউয়িশ আর বেল। নিউট্রন তারা থেকে রেডিও সঙ্কেত কিন্তু নিরবিচ্ছন্ন ভাবে আসে না, হঠাৎ হঠাৎ ঝলক আকারে আমাদের কাছে এসে পৌঁছায়; অনেকটা সমুদ্র সৈকতে সার্চ-লাইটের মত। ঝলকের ইংরেজী হল পালস। তাই এদের নাম দেওয়া হল পালসার। বাংলা করলে আমরা বলতে পারি ঝলক তারা। এই ঝলক তারা আবিস্কার করেই হিউয়িশ নোবেল পুরস্কার পেলেন ১৯৭৪ সালে - কিন্তু জোসলিন বেল পেলেন না। কারণ, জোসলিন বেল ছিলেন হিউয়িশের ছাত্রী।

অনেকেই (যেমন, Sir Frederick Hoyle, Thomas Gold, Jeremiah Ostriker) মনে করেন জোসলিন বেলের প্রতি অন্যায় করা হয়েছিল সেসময়। বেলকে হিউয়িশের সাথেই যুগপৎ নোবেল পুরস্কার দেওয়া উচিৎ ছিল। তবে বিনয়ী বেল কিন্তু তা মনে করেন না। বেলের নিজের কথাতেই শোনা যাক -

'I believe it would demean Nobel Prizes if they were awarded to research students, except in very exceptional cases, and I do not believe this is one of them. Finally, I am not myself upset about it - after all, I am in good company, am I not!"

নোবেল পুরস্কার কিন্তু অনেকেই সময় মত পাননি। চন্দ্রশেখরের কথাই ধরা যাক। শ্বেত বামনের ক্ষেত্রে তার বিখ্যাত সীমা আবিস্কারের পরও তাকে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করে থাকতে হয়েছিল প্রায় পঞ্চাশ বছর। আসলে '৩০ এর দিকে তার বিখ্যাত আবিস্কারের কথা প্রকাশ করে চন্দ্র সে সময় এডিংটনের তোপের মুখে পড়েন। এডিংটন ছিলেন তখন বিলেতের সবচেয়ে নামকরা বিজ্ঞানী। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার ব্যাপক তত্ত্ব উনিই পরীক্ষা করে এর সত্যতা যাচাই করেছিলেন। এডিংটনের তখন ধারণা ছিল চন্দ্র আজে বাজে বকছেন। রয়েল অ্যাস্ট্রনমিকাল

সোসাইটির একটা সম্মেলনে এডিংটন তো চন্দ্রকে রীতিমত হাস্যাস্পদ করে তুললেন। অবস্থা এমনই শোচনীয় হয়ে দাড়ালো যে, চন্দ্র এক সময় সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে আমেরিকায় পাড়ি জমালেন। কারণ তিনি বুঝে ছিলেন এডিংটনের দেশে আর যাই হোক কোন ভাল বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরী পাওয়ার আশা তাঁর নেই। তখন এডিংটনের প্রভাবে আপ্লুত বিজ্ঞানীদের অনেকেই (নিলস বোর, পাউলিরা ছিলেন এ থেকে ব্যতক্রম) চন্দ্রের কথা না মেনে নিলেও পরে কিন্তু সবাই বুঝতে পেরেছিলেন যে এডিংটন নয়, ওই সময় চন্দ্রই আসলে সঠিক ছিলেন। আজ শত শত শ্বেত বামনের অস্তিত্বের কথা আমরা জেনেছি, এর সব গুলোই কিন্তু চন্দ্রের দেখানো নিয়মই অনুসরণ করে - আজ পর্যন্ত একটিও ব্যতিক্রম পাওয়া যায়নি।

এবার আবার একটু পেছনের দিকে যাওয়া যাক। আইনস্টাইনের থিওরী থেকে কিন্তু একটা জিনিস বেরিয়ে আসছিল যে, আমাদের এই মহাবিশ্ব ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। কিন্তু আইনস্টাইন নিজেই সেটা বুঝতে পারলেন না। বুঝতে পারলেন না বলাটা আসলে ঠিক হল না - ঠিকভাবে বললে বলা উচিৎ যে - মানতে চাইলেন না। মাধ্যাকর্ষনের প্রভাবে গ্যালাক্সি গুলোর একে অপরের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়বার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য (মানে মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে একটা ভারসাম্য দেওয়ার জন্য) আইনস্টাইন তার গানিতিক সমীকরণগুলোতে একটা কাল্পনিক ধ্রুবক যোগ করেছিলেন । এটাই সেই বিখ্যাত 'মহাজাগতিক ধ্রুবক' (Cosmological constant) যার সাহায্যে আইনস্টাইন স্থিতিশীল মহাবিশ্বের মডেলের (যা কিনা প্রসারিতও হয় না, আবার সংকুচিতও হয় না) প্রতি আস্থা স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু আইনস্টাইনের আস্থায় অচিরেই চির ধরল।

১৯২৯ সালে এডুইন হাবল (১৮৮৯ - ১৯৫৩) সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়ার মাউন্ট উইলসন মানমন্দির থেকে বিখ্যাত ১০০ ইঞ্চি টেলিসকোপের (হুকার রিফলেকটর) সাহায্যে দূরবর্তী গ্যালাক্সিগুলোর দিকে তাকিয়ে বুঝলেন এরা সবাই আসলে একে অপর থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে; মানে মহাবিশ্ব স্থিতিশীল নয় - বরং প্রসারিত হচ্ছে।

এডুইন হাবল (১৮৮৯ - ১৯৫৩)

কিভাবে হাবল বুঝলেন ব্যাপারটা? বুঝলেন ডপলারের ক্রিয়া (Doppler Effect) থেকে পাওয়া লোহিত সরণ (Red Shift) প্রত্যক্ষ করে। এই ব্যাপারটা একটু পরিস্কার করা যাক। ধরুন, আপনি একটি রেল স্টশনে দাড়িয়ে আছেন। আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন আনেক দূর থেকে ট্রেন যখন হুইসেল বাজাতে বাজাতে যতই আপনার দিকে আসতে থাকে, ততই হুইসেলের শব্দ আপনার কানে তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হতে থাকে। আর ট্রেন যখন আপনাকে অতিক্রম করে চলে যায় শব্দের তীক্ষ্ণতাও কমতে থাকে। ডপলারের ক্রিয়ার কারণেই এটা হয়। তীক্ষ্ণ শব্দের তরঙ্গদৈর্ঘ্য কম হয় মৃদু শব্দের তুলনায়। শব্দের তীক্ষ্ণতা পরিবর্তনের অর্থ আসলে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিবর্তন। এ তো গেল শব্দের কথা। আলোর ক্ষেত্রে তো আর তীক্ষ্ণ শব্দ কানে আসার ব্যাপার থাকছে না, সেক্ষেত্রে যে ব্যাপারটা ঘটে তা হচ্ছে রং এর পরিবর্তন।

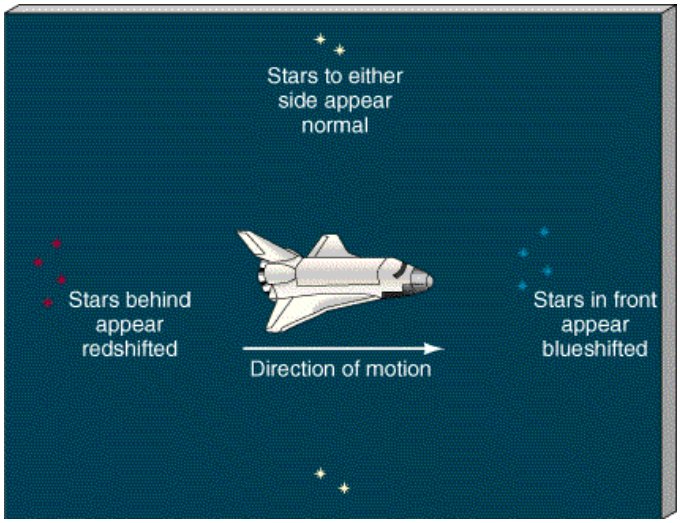

ডপলারের ক্রিয়া

একটা উদাহরণ দেই। ধরা যাক একটা খুব দ্রুতগামী রকেট পৃথিবী থেকে মহাশুণ্যে উৎক্ষিপ্ত হল প্রচন্ড বেগে - যা মোটামুটি আলোর বেগের সাথে তুলনীয়। এখন রকেটের বেগ বাড়াতে থাকলে খুব অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটবে।

রকেটের যাত্রীরা দেখবে যে, সামনের নক্ষত্ররাজি থেকে যে আলো রকেটের দিকে আসছে তা ক্রমশ নীলচে হয়ে উঠছে। সহজ কথায়, রকেটের সামনের দিকের সমস্ত তারাকেই যাত্রীদের চোখে সাধারণ অবস্থার চেয়ে অনেক নীলাভ মনে হবে। রকেটের বেগ যতই বাড়বে রঙ পরিবর্তনের এই ব্যাপারটাও ততই স্পষ্ট হবে। আর রকেটের পেছনের তারারা যাত্রীদের কাছে সাধারণ অবস্থার চেয়ে লালচে হয়ে ধরা পড়বে। আসলে এখানেও রেলগাড়ির শব্দের মত সেই তরঙ্গদৈর্ঘ্যেরই পরিবর্তন। আমাদের চোখে দৃশ্যমান আলোর মধ্যে লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশী, আর বেগুনী আলোর সবচেয়ে কম। আর অন্যান্য রং এর আলো এই দুই তরঙ্গ সীমার মাঝের অঞ্চল ঘিরে থাকে। রঙের পরিবর্তনের এই জ্ঞানটাই কাজে লাগালেন হাবল।

গ্যালাক্সিগুলোর ক্রমশ লালচে হয়ে যাওয়া (যাকে উপরে লোহিত সরণ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে) দেখে হাবল বুঝলেন যে গ্যালাক্সিগুলো আসলে একে অপর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। সরে যাচ্ছে কিন্তু একটা নিয়মকে অনুসরণ করে - এই দুরে সরে যাওয়ার হার এদের দূরত্বের সমানুপাতিক। মানে, একটা গ্যালাক্সি যদি আরেকটা থেকে দ্বিগুন দূরত্বে থাকে, তাহলে তাদের দুরে সরে যাওয়ার বেগও দ্বিগুন হবে। হাবলের এই আবিস্কারটি কিন্তু এই বিশ শতকে জ্যোতির্বিজ্ঞানে এক উল্লখযোগ্য আবিস্কার। এথেকেই বেরিয়ে আসল যে মহাবিশ্ব আসলে প্রসারণশীল। হাবলের এই আবিস্কারের পর আইনস্টাইন নিজেই ঘোষণা করলেন যে, গানিতিক সমীকরনে মহাজাগতিক ধ্রুবকের আমদানী করে মহাবিশ্বকে স্থিতিশীল করার চেষ্টাটা ছিল তাঁর জীবনের সবচাইতে বড় ভুল (Greatest Blunder)। কিন্তু সত্যিই কি আইনস্টাইন এত বড় ভুল করেছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে এই সিরিজের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

মহাবিশ্ব যে প্রসারণশীল তা না হয় বোঝা গেল, কিন্তু কি রকম সেই প্রসারণ? এর কি কোন কেন্দ্র আছে? উত্তর হচ্ছে - না নেই। আমাদের গ্যালাক্সি থেকে হয়ত মনে হতে পারে অন্য সব গ্যালাক্সি যেহেতু আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে (পৃথিবীর বুকে টেলিসকোপ লাগিয়ে দেখলে অন্ততঃ তাই মনে হবে)- আমরাই বোধ হয় এর কেন্দ্রে।

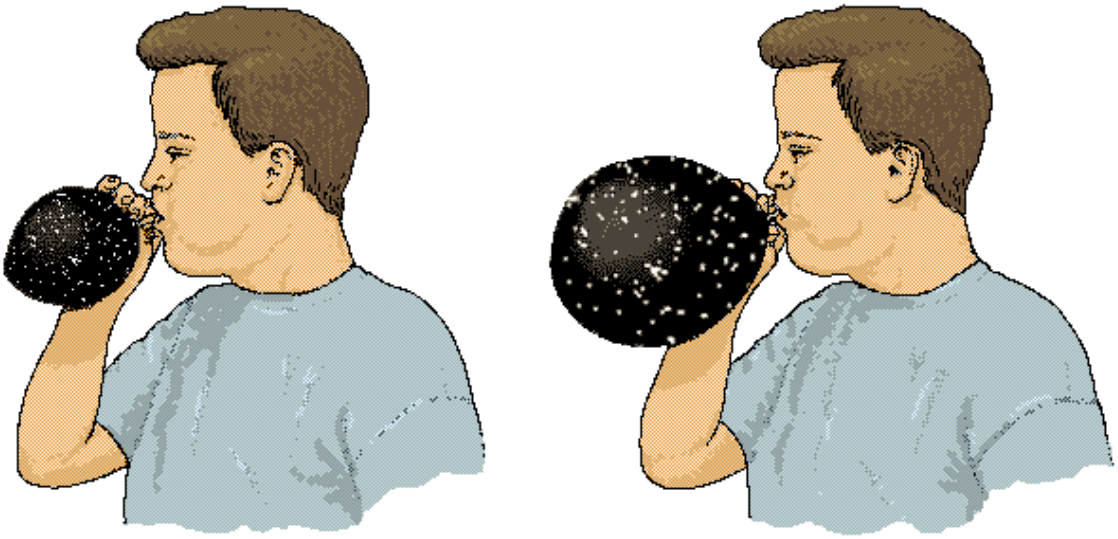

Draw spots on a balloon to represent galaxies in the universe.

As you blow up the balloon, the "galaxies" move further apart.

কিন্তু আসলে তা নয়। এই প্রসারনটা আসলে সম্পূর্ণ সুষম; মানে যে কোন গ্যালাক্সিতে গিয়ে এই পরীক্ষা করলেও একই ফলাফল পাওয়া যাবে - মনে হবে অন্য গ্যালাক্সিগুলো দুরত্বের সমানুপাতিক হারে সেই গ্যালাক্সি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কাজেই কোন গ্যালাক্সিই এই 'মহাবিশ্বের কেন্দ্র' হিসেবে নিজেকে কখনও দাবী করতে

পারে না। ব্যাপারটাকে পাঠকদের কাছে উপরের ছবির ফোলানো বেলুনের উদাহরন দিয়ে আরো ভালভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। বেলুনের বাইরের আবরনটাকে মহাশুন্য হিসেবে ভাবা যাক। বেলুনের গায়ে ছোট ছোট গোলাকার কতকগুলো দাগ কেটে সেগুলোকে গ্যালাক্সি বলে ভেবে নেই। এখন ফু দিয়ে যতই বেলুনটাকে ফোলানো হবে, দাগ গুলোর (মানে গ্যালাক্সি গুলোর) মধ্যকার দূরত্ব কিন্তু বাড়তে থাকবে, কিন্তু কোন গ্যালাক্সিই দাবী করতে পারবে না যে সে বেলুনের কেন্দ্রে, কারণ ফোলানো বেলুনের তো কোন কেন্দ্র নেই।

গ্যালাক্সিগুলো যে একে অপরের থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে, তা দেখে বিজ্ঞানীরা ধারণা করেছেন যে, অতীতে নিশ্চয়ই এরা খুব কাছাকাছি ছিল আর এ ধারণাও করা বোধ হয় অমূলক হবে না - সৃষ্টির আদিতে তাহলে সব কিছুই খুব ঘন সন্নিবদ্ধ অবস্থায় গাঁট-বন্দী (densely packed) হয়ে ছিল; সেই অবস্থা থেকেই সব কিছু চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এটাই বিখ্যাত 'বিগ-ব্যাঙের' ধারণা । এই ধারনা অনুযায়ী এই মহাবিশ্ব প্রায় ১৫০০ কোটি বছর আগে এক মহা-বিস্ফোরনের মাধ্যমে অতিঘন উত্তপ্ত (hot super densed state) আর অসীম ঘনত্বের এক পুঞ্জিভূত অবস্থা (যাকে পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় অদ্বৈত বিন্দু (Singularity point)) থেকে সৃষ্ট। দেশ কালের ধারণাও এসেছে এই বিগ-ব্যাঙের পর মুহুর্ত থেকেই; কাজেই তার আগে কি ছিল - এই প্রশ্ন বিজ্ঞানের ভাষায় একেবারেই অর্থহীন। আসলে অর্থহীন এ কারণে যে, আমাদের পরিচিত পদার্থবিজ্ঞানের সুত্র দিয়ে ওই অবস্থাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। আমরা এর আগে দেখেছি নিউটনের সূত্রকে আলোর বেগের কাছাকাছি অবস্থায় এসে ভেঙে পড়তে। তেমনি আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতত্ত্বসহ অন্যান্য যে সূত্রগুলো মহাবিশ্বের রহস্য উদঘাটনে আজ ব্যবহৃত হচ্ছে - সিংগুলারিটি বিন্দুতে গিয়ে সেগুলোও কিন্তু কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। বিজ্ঞানীদের ধারণা প্রকৃতি জগতের চারটি বল - সবল নিউক্লিয় বল, দুর্বল নিউক্লিয় বল, তড়িচ্চুম্বকিয় বল এবং মাধ্যাকর্ষণ বল এই চারটি বল 'সুপার ফোর্স' হিসেবে একসাথে মিশে ছিল সৃষ্টি শুরুর $১০^{-৪৩}$ সেকেন্ড পর্যন্ত। প্রথম এক সেকেন্ড পরে কোয়ার্ক, ইলেকট্রন, প্রোটন নিউট্রনের মত মৌলিক কণাগুলো গঠিত হয়। সৃষ্টির তিন সেকেন্ড পরে প্রোটন আর নিউট্রন মিলে তৈরী হল নিউক্লিয়াস, তার পর হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম। কিন্তু সৃষ্টির প্রায় ১ লক্ষ বছর পর্যন্ত আমরা যাকে পদার্থ বলি সেরকম কিছুই তৈরী হয় নি। তখন আসলে একস রে আর রেডিও ওয়েভের মত তেজস্ক্রিয় রশ্মিরাই বরং পদার্থের উপরে রাজত্ব করছিল। নিউক্লিয়াস থেকে অনু-পরমানু আর তার পর মুক্ত ইলেকট্রন তৈরী হতে আসলে আক্ষরিক অর্থেই বিস্তর সময় লেগেছে। আর তার পরই কেবল তেজস্ক্রিয়তার উপর পদার্থের আধিপত্য শুরু হয়েছে। এরপর আরও ২০ কোটি বছর লেগেছে গ্যালাক্সি জাতীয় কিছু তৈরী হতে। আর আমাদের যে গ্যালাক্সি - যাকে আমরা নাম দিয়েছি 'মিল্কিওয়ে' - সেখানে সূর্যের সৃষ্টি হয়েছে আজ থেকে প্রায় ৫০০ কোটি বছর আগে।

আর সূর্যের চারপাশে ঘূর্ণায়মান গ্যাসের চাকতি, ভগ্নস্তুপ থেকে আজ থেকে প্রায় ৪৫০ থেকে ৪৬০ কোটি বছরের মধ্যে তৈরী হয়েছে পৃথিবী সহ অন্যান্য গ্রহমন্ডলী।

এই হচ্ছে সাদা-মাঠা ভাবে আমাদের বিশ্বজগৎ সৃষ্টির ইতিকথা। 'সাদা-মাঠা' শব্দটি ইচ্ছে করেই এখানে ব্যবহার করলাম, কারণ, এই আশ্চর্য এই সৃষ্টিরহস্যের (বিশেষ করে প্রথম কয়েক মিনিটে কি ঘটেছিল) পেছনে লুকিয়ে আছে আসলে কতগুলো ধারণা আর ভারী ভারী তত্ত্ব কথা, যার অনেক কিছুই কিন্তু এখনও খুব পরিস্কার নয়। এখানে নানা মুনির নানা মত। তবে অধিকাংশ (সবাই নয়) মুনিই এখন একটি বিষয়ে অন্ততঃ একমত হয়েছেন যে বিগ-ব্যাং বলে একটা কিছু আসলেই ঘটেছিল। কিভাবে বুঝলেন? হাবলের আবিস্কারের কথা তো পাঠকদের আগেই বলা হয়েছে । কিন্তু পাঠকদের অনেকেই নাক সিটকিয়ে বলতে পারেন যে, হাবলের আবিস্কার তো আসলে মহাবিশ্বের প্রসারণের কথাই শুধু বলছে, বিগ-ব্যাঙের তো আর নয়। হ্যা, কথাটা ঠিকই। তবে, হাবলের অবিস্কারের পর বিগ ব্যাঙের পক্ষে সবচেয়ে জোড়ালো সাক্ষ্য পাওয়া গেছে ১৯৬৪ সালে - 'কসমিক ব্যক গ্রাউন্ড রেডিয়েশন' থেকে।

এই ব্যাপারটা সম্বন্ধে কিছু বলতে হলে প্রথমে জর্জ গ্যামোর কথা কিছু বলে নিতেই হয়। বিশ্বপিতা অথবা জাতির পিতার মত 'বিগ-ব্যাঙের পিতা' বলে যদি কিছু থেকে থাকে তবে সেই উপাধিটা নিঃসন্দেহে গ্যামোর ঘাড়েই বসবে। রাশিয়ার এই রসিক আর খেয়ালী বিজ্ঞানী (যিনি আবার ছিলেন একজন শখের জাদুকর), প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে একার চেষ্টাতেই বলা যায় বিগ-ব্যাঙের ধারণাকে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।

জর্জ গ্যামো (১৯০৪-১৯৬৮)

স্ট্যালিনের আমলের শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা সহ্য করতে না পেরে রাশিয়া থেকে পালিয়ে গ্যামো তখন সবে মাত্র এসেছেন জর্জ ওয়াসিংটন ইউনিভার্সিটিতে। তখন (১৯৪০ সালের দিকে) গ্যামোর অধীনে পি.এইচ.ডি করার জন্য রালফ আলফার নামে একজন মেধাবী গ্রাজুয়েট ছাত্র ইউনিভার্সিটিতে যোগ দেয়। এসময়ই আলফারের সাথে কাজ করতে গিয়ে বিগব্যাঙের ধারণা প্রথমে গ্যামোর মাথায় আসে। হাবলের প্রাসারণশীল বিশ্বের কথা গ্যামো তো জানতেনই। আরেকটু বাড়তি চিন্তা করে ভাবলেন, যদি তাই হয়, তবে সমস্ত মহাবিশ্ব নিশ্চয়ই একটি মাত্র বিন্দু থেকে একসময় উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল;

যাকে আমরা এখন বিগ ব্যাং নামে অভিহিত করছি। তবে গ্যামো নিজে কিন্তু এই 'বিগ-ব্যাঙ' শব্দটি প্রথমে ব্যবহার করেন নি। আসলে গ্যামোর ধারণাকে খন্ডন করতে গিয়ে আরেক বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ফ্রেড হয়েল (যিনি বিগব্যাং তত্ত্বের বিপরীতে 'Steady State' নামে আরেকটি জনপ্রিয় তত্ত্বের প্রবক্তা) প্রথম 'বিগ ব্যাঙ' শব্দটি ব্যবহার করেন। আর তার পর থেকেই এই শব্দটি ধীরে ধীরে বিজ্ঞানে স্থায়ী আসন করে নেয়। যা হোক, আলফারের পি এইচ ডির শেষ পর্যায়ে, আলফার আর গ্যামো মিলে 'Physical Review' জার্ণালের জন্য 'origin of the chemical elements' নামে একটি পেপার লিখতে শুরু করলেন। আর একখানেই রসিকরাজ গ্যামো বিজ্ঞানের জগতে সবচেয়ে বড় রসিকতাটি করে বসলেন। জার্ণালে পাঠনোর সময় তিনি তাঁর বন্ধু আরেক পদার্থবিদ হ্যানস বেথের (কর্নেল ইউনিভার্সিটি, নিউইয়র্ক) নাম তাঁকে না জানিয়েই সেই পেপারের লেখক হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে দেন। পরে কারণ হিসেবে বলেছিলেন - ''আরে 'আলফার' আর 'গ্যামো' -এই দুই গ্রীক ধরনের নামে র মাঝে 'বেটা' জাতীয় কিছু থাকবে না - এ হয় নাকি? তাই বেথেকে দলে নেওয়া!'' আর সত্যই ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসের ১ তারিখে এই তিন বিজ্ঞানীর নামেই কিন্তু পেপারটি প্রকাশিত হল - যা পরবর্তীতে গ্যামোর রসিকতাকে সত্যি প্রমানিত করে এখন 'আলফা-বেটা-গামা পেপার' নামেই বৈজ্ঞানিক মহলে সুপ্রতিষ্ঠিত!

কিন্তু সেই পেপারে কি বলেছিলেন গ্যামো? গ্যামো ধারণা করেছিলেন যে, একটা উত্তপ্ত মহাবিস্ফোরনের মাধ্যমে যদি এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে সেই ভয়ঙ্কর তেজস্ক্রিয়তার কিছুটা 'সাক্ষর' তো এখনও বজায় থাকা উচিৎ। গ্যামো গণনা করে দেখালেন, সৃষ্টির আদিতে তেজস্ক্রিয়তার যে উদ্ভব হয়েছিল, মহাবিশ্বের প্রসারণের ফলে তার বর্ণালী হ্রাস পেয়ে এখন পরম শূন্য তাপমাত্রার উপরে ৫ ডিগ্রীর মত বেশী হওয়ার কথা। এই ব্যাপারটিকে বলে 'মহাজাগতিক পশ্চাদপট তেজস্ক্রিয়তা' (Cosmic background radiation)। মহাশুন্যে এই তেজস্ক্রিয়তা পাওয়া যাবে মাইক্রোওয়েভ আকারে। সহজ কথায় মনে করা যাক, বিশ্ব ব্রহ্মান্ড সৃষ্টির আদিতে ছিল একটা গরম মাইক্রোওয়েভ চুল্লী যা এখন ঠান্ডা হয়ে ৫ ডিগ্রী কেলভিনে এসে পৌঁছেছে। এই ব্যাপারটিই পরীক্ষায় ধরা পড়ল ১৯৬৪ সাল নাগাদ - আর্নো পেনজিয়াস আর রবার্ট উইলসনের পরীক্ষায়। ব্যকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন মেপে তারা গ্যামোর তত্ত্বের খুব কাছাকাছি ফলাফল পেলেন - পরম শুন্যের উপর প্রায় ৩ ডিগ্রী। এই আবিস্কারের জন্য পেনজিয়াস আর উইলসন নোবেল পুরস্কার পান ১৯৭৮ সালে - গ্যামোর মৃত্যুর ১০ বছর পর। নোবেল পুরস্কার 'মরণোত্তর' হিসেবে দেওয়ার কোন রীতি নাই। যদি থাকত, গ্যামোকে চোখ বন্ধ করে বোধহয় তখন নির্বাচিত করা হত -যিনি প্রায় একক প্রচেষ্টায় বিগ-ব্যাঙকে আজ বিজ্ঞানের জগতে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। বোধ হয় কিছু জিনিস এ পৃথিবীতে সব সময়ই থাকবে যা নোবেল পুরস্কারের চেয়েও বেশী দামী আর গুরুত্বপুর্ণ!

পেনজিয়াস আর উইলসনের বিখ্যাত cosmic microwave background radiation আবিস্কারের পর তিন দশকেরও বেশী সময় কেটে গেছে। এই তো মাত্র ক' বছর আগে -১৯৮৯ সালের নভেম্বর মাসে নাসা তার গোদার্দ স্পেস ফ্লাইট সেন্টার থেকে Cosmic Background Explorer (COBE) নামে একটি উপগ্রহ মহাশুন্যে প্রেরণ করল। এবারে কিন্তু আর মান্ধাত্যার আমলের যন্ত্রপাতি নয়, বরং অত্যন্ত সংবেদনশীল যন্ত্রপাতির সাহায্যে নিখুত ভাবে ব্যকগ্রাউন্ড রেডিয়েশনের অস্তিত্ব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হল। ফলাফল কিন্তু পেনজিয়াস আর উইলসনের সাথে অনেকাংশে মিলে গেল (2.725 +/- 0.002 K)। গ্যামোর মহাবিস্ফোরণের ধারণা তাহলে সম্পুর্ণ সঠিকই ছিল!

৫ম পর্ব...

আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী -৫

অভিজিৎ রায়
www.mukto-mona.com

পাঠকদের অনেকেই ব্যক্তিগত ভাবে ই-মেইল করে এই সিরিজটির প্রতি তাঁদের আগ্রহ আর ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছেন; তাঁদের কথা মনে রেখেই এটিকে এগিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা। সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

অভিজিৎ
২৭/৭/২০০৩

পূর্ববর্তী পর্বের পর হতে...

১

মোটামুটি সকল বিজ্ঞানীরাই এখন এ ব্যাপারটি মেনে নিয়েছেন যে, প্রচন্ড ঘন আর উত্তপ্ত অবস্থা থেকে ভয়ঙ্কর এক মহাবিস্ফোরনের মধ্য দিয়ে আমাদের এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি। তবে সেই ঘন আর উত্তপ্ত অবস্থাটা কিরকম আমরা এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। আর কেনই বা এই বিস্ফোরণ হয়েছিল তাও খুব পরিস্কার নয়। আসলে মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণটা কি আর কেনই বা এই মহাবিশ্বের অস্তিত্ব তা এখনও বিজ্ঞানের আওতার বাইরে। বড় বড় বিজ্ঞানীরা তাদের পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা আর জ্ঞান থেকে বিভিন্ন ধরনের অনুকল্প হাজির করেছেন - তবে তাদের ধারণা সঠিক কিনা এটা জানবার মত পর্যাপ্ত তথ্য এখনও আমাদের হাতে নেই। কেন বিজ্ঞান বিগ-ব্যাং বা তার পূর্ববর্তী অবস্থাকে এ মুহূর্তে ব্যাখ্যা করতে পারছে না? সহজ কথায়, সৃষ্টির আদিমতম অবস্থাকে ব্যাখ্যা করা মত উপযুক্ত তত্ত্ব এখনও আমাদের হাতে নেই। বিজ্ঞানীরা 'ধারণা' করেন যে, মহাকর্ষ সহ অন্যান্য মৌলক বলগুলো (তড়িচ্চুম্বক বল, সবল নিউক্লিয় বল আর দুর্বল নিউক্লিয় বল) একীভুত অবস্থায় বিরাজ করত বিগ-ব্যাং ঘটে যাবার $১০^{-৪৩}$ সেকেন্ড পর্যন্ত। প্রকৃতি জগতের এই চারটি মৌলিক বল সম্পর্কে এই

ফাঁকে কিছু বলে নেওয়া যাক। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই চারটি বল একটি অপরটি থেকে সবসময়ই ভিন্ন আচরণ প্রকাশ করে। মহাকর্ষ এবং তড়িচ্চুম্বক বলের সীমা অনেক বেশী, এদেরকে বলে ব্যস্ত-বর্গ বল (inverse square forces), কিন্তু সবল আর দুর্বল নিউক্লিয় বলগুলোর সীমা অনেক অল্প - যথাক্রমে $১০^{-১৫}$ এবং $১০^{-১৭}$ মিটার মাত্র। আর তা ছাড়া এই বলগুলো সব পদার্থের উপরই একই রকমভাবে ক্রিয়া করে তাও নয়। যেমন, মহাকর্ষের প্রভাব রয়েছে সকল পদার্থের উপরেই। কিন্তু তড়িচ্চুম্বক বল ক্রিয়া করে শুধু আধানযুক্ত কণার (Charged particle) উপরে। সবল নিউক্লিয় বল প্রোটন বা নিউ ট্রনের মত নিউক্লিয় কণার উপরে শুধু কার্যকরী, ইলেকট্রন এবং নিউট্রিনোর উপর এর কোন প্রভাব নেই। আর দুর্বল বল নিউক্লিয় বিক্রিয়া আর তেজস্ক্রিয় ক্ষয়িষ্ণুতার উপরেই কেবল কার্যকরী। সবল নিউক্লিয় বল তড়িচ্চুম্বকীয় বলের চেয়ে ১৩৭ গুন শক্তিশালী, দুর্বল নিউক্লিয় বলের চেয়ে ১ লক্ষ গুন আর মহাকর্ষের চেয়ে প্রায় $১০^{৩৯}$ গুন শক্তিশালী।

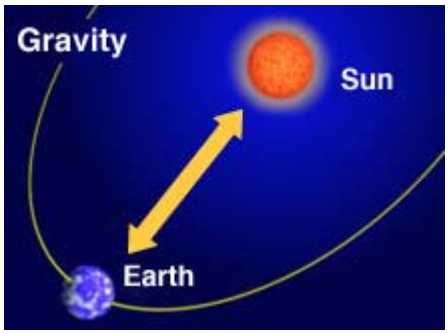

Known as gravity, the distance over which this force acts is infinite.

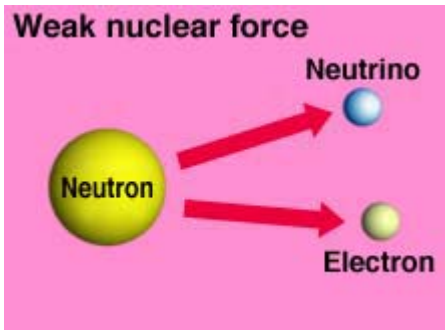

This force causes natural neutron decay (beta decay). As a result, the neutron for a short time becomes a proton. Distance over which this force acts is 1/100,000,000 ~ 1/100,000,000 ~ 10 cm.

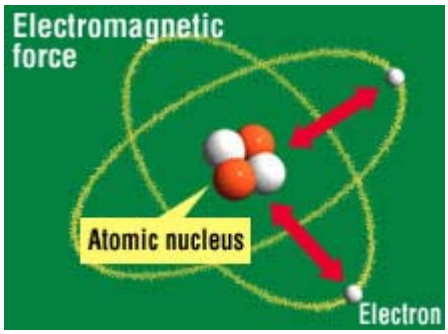

This force acts on electrically charged particles. It is the force that binds electrons to atomic nuclei. The distance over which this force acts is infinite.

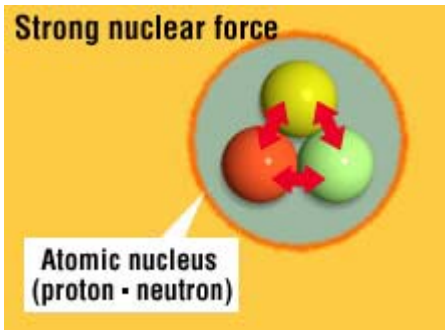

This force bonds quarks together. It works to stabilize neutrons, protons and atomic nuclei. Distance over which this force acts is 1/100,000,000 ~ 1/10,000 ~ 10 cm.

১৯২০ সালের পর হতেই আইনস্টাইন প্রকৃতি জগতের এই মৌলক বল চারটিকে একীভুত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। খুবই উচ্চাভিলাসী ছিল তার সেই স্বপ্ন। বহুবার আইনস্টাইন ভেবেছিলেন যে তার স্বপ্নের জাদুর কাঠি বুঝি হাতে পেয়ে গেছেন - কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার সেই স্বপ্ন অপূর্ণই থেকে যায়। আইনস্টাইনের মৃত্যুর দুই দশকের মধ্যে পদার্থবিদরা এই একীভুত ত্তত্বের ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেন।

আবদুস সালাম (১৯২৬-১৯৯৬)

ষাটের দশকে এই ত্তত্বীয় পদার্থবিদরা সফল ভাবে তড়িচ্চুম্বকীয় বল আর দুর্বল নিউক্লিয় বলকে 'এক করতে' সমর্থ হন যাকে এখন অভিহিত করা হয় 'দুর্বল তড়িৎ' বল (electro-weak force) হিসেবে। ১৯৭০ সালে দুর্বল তড়িৎ তত্ত্বের পরীক্ষালব্ধ সত্যতা নির্নীত হয়। এই সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ আবদুস সালাম, স্টিফেন ওয়েইনবার্গ আর শেলডন গ্লাসো ১৯৭৯ সালে নোবেল পুরস্কারে ভুষিত হন। এর পর থেকেই বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টা শুরু হয় দুর্বল তড়িৎ আর সবল নিউক্লিয় বলকে একীভুত করার ব্যাপারে।

যে থিওরীগুলো এই দুর্বল তড়িৎ আর সবল নিউক্লিয় বলকে একীভূত করে তাদের বলা হয় Grand Unified Theories বা সংক্ষেপে GUTs. এই থিওরী হতে এটা সাধারণভাবে অনুমান করা হয় যে, এই তিনটি (সবল, দুর্বল আর তড়িচ্চুম্বক) নন-গ্র্যাভিটেশনাল বল সৃষ্টির প্রথম দিকে একীভূত অবস্থায় ছিল - যখন তাপমাত্রা ছিল প্রায় $১০^{২৮}$ ডিগ্রীর মতন। এটি উল্লেখ্য যে, এরকম অতি উচ্চ তাপমাত্রা তৈরী করা সহজ নয় বলে GUTs এর পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নি।

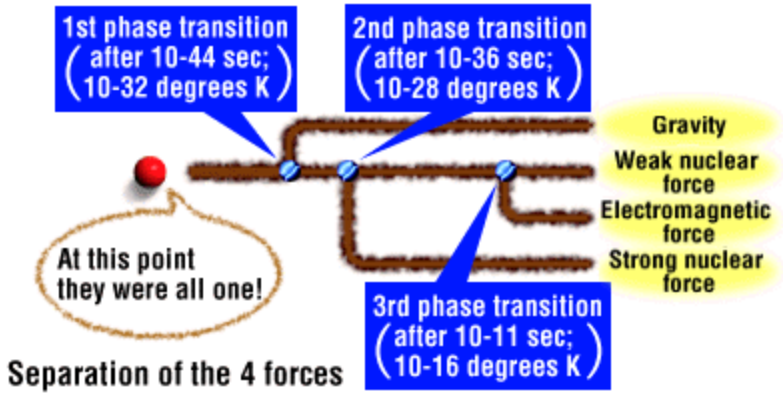

মহাকর্ষকে কোয়ান্টাম বল গুলোর সাথে সংযুক্তির চেষ্টায় এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা সাফল্যের মুখ দেখেননি। কিছু বিজ্ঞানীরা ব্যাপারটার সমাধান করতে চাইছেন গ্রাভিটন নামে একটা নতুন কণা কল্পণা করে - যা মহাকর্ষ বলের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। আলোর ক্ষেত্রে যেমন ফোটন কণা, তেমনি গ্রাভিটির ক্ষেত্রে কল্পণা করা হয়েছে গ্র্যাভিটন। তবে সমস্যা হচ্ছে যে, এভাবে মহাকর্ষের যে ছবিটা উঠে আসে তা কিন্তু আইনস্টাইন প্রদত্ত জ্যামিতিক ছবি (রিলেটিভিটি থেকে প্রাপ্ত) থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এভাবে প্রাপ্ত সমাধান শুধু জটিলই নয়, অনেক বিজ্ঞানীর কাছেই অগ্রহনীয়। বিকল্প সমাধানটি হচ্ছে আইনস্টাইনের দেওয়া জ্যামিতি থেকেই যাত্রা শুরু করা। এটি আসলে কিছুই নয়- মৌলিক বলগুলোকে দেশ-কালের (space-time) একটি অতিরিক্ত বক্রমাত্রার সাহায্যে ব্যাখ্যার প্রয়াস।

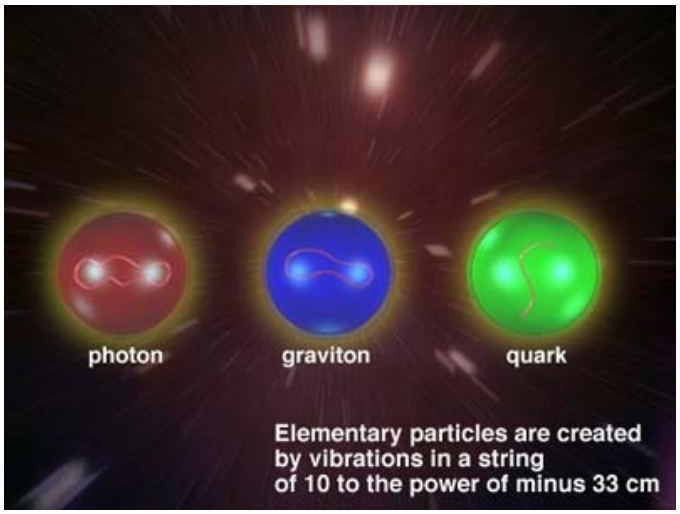

সুপারস্ট্রিং তত্ত্বের ভিত্তি গড়ে উঠেছে আসলে এই ধারণা থেকেই। ক্যালিফর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হাঙ্গেরিয়ান তত্ত্বীয় পদার্থবিদ John Schwarz এই তত্ত্বের মূল প্রবক্তা। এই তত্ত্ব অনুযায়ী পদার্থের ক্ষুদ্রত্তম অংশগুলো কোন মৌলিক কণা নয়, বরং খুবই ছোট কম্পণশীল তন্তু (vibrating string)। তন্তুগুলোর দৈর্ঘ্য $১০^{-৩৩}$ সেন্টিমিটার। স্ট্রিং তত্ত্বের ধারণা অনুযায়ী, এই মহাবিশের বিস্তার দেশ কালের ১০ টি মাত্রায়। এর মধ্যে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ উচ্চতা আর সময় -এই চারটি সম্পর্কে আমরা ওয়াকিবহাল, কিন্তু বাকী ছয়টি মাত্রা আমাদের অগোচরেই স্ট্রিং এর মধ্যে কোকড়ানো অবস্থায় রয়ে গিয়েছে। গানিতিক জটিলতা আর বিমূর্ত ধারণা থাকা সত্ত্বেও অনেক পদার্থবিদরাই মনে করেন সুপার স্ট্রিং তত্ত্ব প্রকৃতিজগতের মৌলিক বলগুলিকে একীভূত করার প্রচেষ্টায় আশার আলো দেখাচ্ছে। তবে এখনি এ বিষয়ে শেষ কথা বলবার সময় আসেনি। ভবিষ্যতের গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলই আমাদের সঠিক পথটি একসময় দেখিয়ে দিবে।

২

আগের পর্বে আমরা প্রসারণশীল মহাবিশ্ব সম্বন্ধে কিছুটা হলেও ধারণা পেয়েছি; বুঝেছি যে, এই মহাবিশ্ব আসলে প্রতি মুহূর্তেই প্রসারিত হচ্ছে। কিন্ত প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের এই মহাবিশ্ব কি সবসময়ই এমনিভাবে প্রসারিত হতে থাকবে? নাকি মহাকর্ষের টান একসময় গ্যালাক্সিগুলোর মধ্যকার প্রসারণের গতিকে মন্থর করে দিবে - যার ফলে এই প্রসারণ থেমে গিয়ে একদিন শুরু হবে সংকোচন? এই প্রশ্নটার উপরই কিন্তু আমাদের এই মহাবিশ্বের অন্তিম পরিনতি নির্ভর করছে। প্রসারণ চলতেই থাকবে নাকি এক সময় তা থেমে যাবে - এই ব্যাপারটা যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর নির্ভর করছে তা হল মহাবিশ্বের Critical Density ; বাংলা করলে আমরা বলতে পারি -'সন্ধি-ঘনত্ব'। এই সন্ধি ঘনত্বের বিষয়টা একটু পরিস্কার করা যাক। ধরা যাক, ভূ-পৃষ্ঠ থেকে একটা রকেট মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত হল। এর পরিণতি কি হতে পারে? এক্ষেত্রে সম্ভাবনা দুটি।

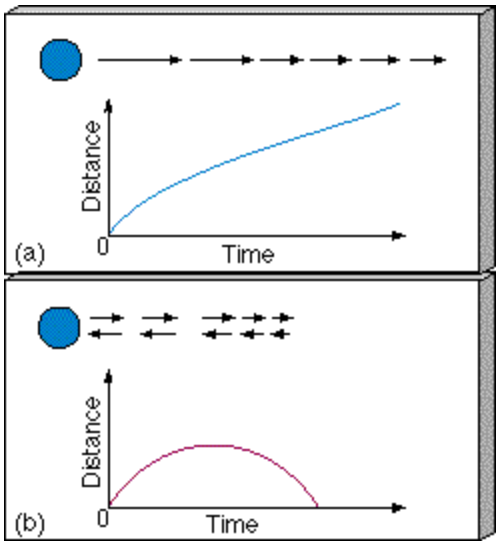

রকেটের বেগ যদি পৃথিবীর মুক্তিবেগের (escape velocity) চেয়ে বেশী হয় - মানে, এর বেগ যদি মাধ্যাকর্ষণকে অতিক্রম করার মত যথেষ্ট শক্তিশালী হয় - তবে তা আর পৃথিবীতে ফিরে আসবে না। তার প্রক্ষেপণের গতিপথ হবে পাশের প্রথম ছবির (a) মত অসীম বা অনন্ত (unbounded)। কিন্তু রকেটের বেগ যদি মুক্তিবেগের চেয়ে কম হয়, তবে তা চলতে চলতে একটা নির্দিষ্ট উচ্চতায় উঠবার পর মাধ্যাকর্ষনের টানে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবে। এবারে কিন্তু প্রক্ষেপণের পথ আগের মত 'অনন্ত' হবে না; বরং হবে দ্বিতীয় ছবির(b) ছবির মত সীমাবদ্ধ (Bounded)।

মহাবিশ্বের অবস্থাও আমাদের উদাহরনের ওই রকেটের মতন। এর কাছেও এখন দুটি পথ খোলা। এক হচ্ছে সারা জীবন ধরে এমনিভাবে প্রসারিত হতে থাকা -এ ধরনের মহাবিশ্বের মডেলকে বলে অনন্ত মহাবিশ্ব (unbounded universe); আরেকটি সম্ভাবনা হল- মহাবিশ্বের প্রসারণ একসময় থেমে গিয়ে সংকোচনে রূপ নেওয়া - এ ধরনের মহাবিশ্বকে বলে বদ্ধ মহাবিশ্ব (bounded)।

বিজ্ঞানীরা অবশ্য এ দুই সম্ভাবনার মাঝামাঝি আরেকটি সম্ভাবনাকেও হাতে রেখেছেন। এর নাম দেওয়া যাক - 'বদ্ধ-প্রায় মহাবিশ্ব' (marginally bounded universe)। এধরনের মহাবিশ্ব সবসময়ই প্রসারিত হতে থাকবে ঠিকই কিন্তু এক্কেবারে দেওয়াল ঘেষে ঘেষে- অনেকটা পাশমার্ক পেয়ে কোন রকমে পাশ করে যেতে থাকা ছেলেপিলেদের মতন।

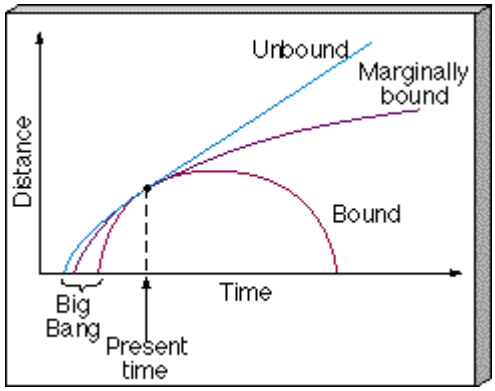

আমাদের রকেটের উদাহরণে ঠিক মুক্তিবেগের সমান (এর বেশীও নয়, কমও নয়) বেগ দিয়ে রকেটটাকে শুন্যে ছেড়ে দিলে যে রকম অবস্থা হত, অনেকটা সেরকম।

মহাবিশ্বের পরিনতির এই তিন ধরনের সম্ভাবনাকে উপরের ছবির সাহায্যে দেখানো হয়েছে।

এখন কথা হচ্ছে, আমাদের মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে কোন্ ধরনের পরিনতি ঘটতে যাচ্ছে তা বোঝা যাবে কি ভাবে? আবার কিন্তু সামনে চলে আসছে সেই মহাবিশ্বের ঘনত্বের ব্যাপারটা। মহাবিশ্বের ঘনত্ব বলতে সমগ্র মহাবিশ্ব যে পদার্থসমূহ দিয়ে তৈরী তার ঘনত্বের কথাই বলছি। পদার্থ যত বেশী হবে - মহাবিশ্বও তত ঘন হবে -আর সেই সাথে বাড়বে প্রসারণকে থামিয়ে দেওয়ার মত মহাকর্ষের শক্তিশালী টান। জিনিসটা বুঝতে আবার আমাদের রকেটের উদাহরণে ফেরত যেতে হবে। রকেটের ওজন যত বেশী হবে মাধ্যাকর্ষন পেরিয়ে মুক্তি বেগ অর্জন করতে তাকে তত বেশী কষ্ট করেতে হবে। ঠিক তেমনি ভাবে, মহাবিশ্ব উচ্চ ঘনত্ব বিশিষ্ট হলে প্রসারণকে থামিয়ে দিয়ে সংকোচনের দিকে ঠেলে দেওয়ার মত যথেষ্ট পদার্থ এতে থাকবে -ফলে মহাবিশ্ব হবে বদ্ধ (bound)। আর কম ঘনত্ববিশিষ্ট মহাবিশ্ব সঙ্গত কারণেই হবে মুক্ত (unbounded)- যা প্রসারিত হতে থাকবে অনন্ত কাল ধরে। তাহলে এর মাঝামাঝি এমন একটা ঘনত্ব নিশ্চয়ই আছে যার উপরে গেলে মহাবিশ্ব এক সময় আর প্রসারিত হবে না। সন্ধি ঘনত্ব (Critical density) হচ্ছে সেই ঘনত্ব যা মহাবিশ্বের প্রসারণকে থামিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। বিজ্ঞানীদের ধারণা এর মান ১.১ x ১০$^{-২৬}$ কিলোগ্রাম পার কিউবিক মিটারের মতন। মহাবিশ্বের আসল ঘনত্ব (actual density)আর সন্ধি ঘনত্বের (critical density) অনুপাতকে পদার্থবিদরা খুব গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন; এর নাম তারা দিয়েছেন ওমেগা (Ω)। এই ওমেগার মান ১ এর কম হলে মহাবিশ্ব হবে মুক্ত বা অনন্ত (open / unbounded)। আর ওমেগার মান ১ এর বেশী হলে মহাবিশ্ব হবে বদ্ধ (closed / bounded)। আর ওমেগার মান পুরোপুরি ১ হলে প্রসারণের হার ধীরে ধীরে কমে যেতে যেতেও টায়ে টায়ে পাশ করা ছাত্রের মত প্রসারিত (flat / marginally bounded) হতে থাকবে শেষ পর্যন্ত।

সম্ভাবনাগুলোর কথা না হয় বোঝা গেল, কিন্তু মহাবিশ্বের আসল ঘনত্ব না জানলে তো হলফ করে বলা যাচ্ছে না রোজ হাসরের ময়দানে আমাদের মহাবিশ্বের ভাগ্যে আসলে ঠিক কি রয়েছে! তা হলে তো আসল ঘনত্ব জানতেই হচ্ছে। কিন্তু আসল ঘনত্ব বের করার উপায় কি? একটা উপায় হল মহাশূন্যের দৃশ্যমান গ্যালাক্সিগুলোর ভর একের পর এক যোগ করে তাকে পর্যবেক্ষনরত স্পেসের আয়তন দিয়ে ভাগ করা। মহাবিশ্বের পদার্থগুলোর একটা গড় ঘনত্ব পাওয়া যাবে এতে করে। কিন্তু মুশকিল হল এভাবে পদার্থের যে ঘনত্ব পাওয়া গিয়েছে তা হাস্যকর রকমের কম - সন্ধি ঘনত্বের শতকরা ১ - ২ ভাগ মাত্র। তার মানে ঠিক কি দাড়লো? দাড়ালো এই যে এই মান সঠিক হলে ওমেগার মান দাড়ায় ১ এর অনেক অনেক কম। তাহলে আমদের সামনে চলে আসলো

সেই মুক্ত বা অনন্ত মহাবিশ্বের মডেল। তার মানে কি এই যে, মহাশুন্য আজীবন প্রসারিত হতে থাকবে?

না, তাও নিশ্চিতভাবে এখনই বলা যাচ্ছে না। ব্যাপারটা এত সহজ নয়। বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই প্রমাণ পেয়েছেন যে, আমদের দৃশ্যমান পদার্থের বাইরেও মহাশুণ্যে একধরনের রহস্যময় পদার্থ রয়েছে যাকে বলা হয় গুপ্ত পদার্থ (Dark Matter)। এই অদৃশ্য পদার্থগুলোর অস্তিত্ব শুধুমাত্র গ্যালাক্সির মধ্যে মহাকর্ষের প্রভাব থেকেই জানা গিয়েছে, কোন প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ থেকে নয়। বিজ্ঞানের জগতে এমন অনেক কিছুই আছে যা প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গৃহীত হয় নি, হয়েছে পরবর্তীতে পাওয়া পরোক্ষ প্রমাণ, অনুসিদ্ধান্ত বা ফলাফল থেকে। তবে তা বলে সেগুলো বিজ্ঞান-বিরোধীও নয়। যেমন, বিগ-ব্যাং এর ধারণা। কেউ চোখের সামনে বিগ-ব্যাং সংগঠিত হতে দেখেনি। কিন্তু কসমিক ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন সহ অন্যান্য পরোক্ষ প্রমাণগুলো কিন্তু ঠিকই বিগ-ব্যংকে বিজ্ঞানের জগতে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এমনি আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে বিবর্তনবাদ - যার চাক্ষুস প্রমাণ পাওয়া অসম্ভব হলেও অসংখ্য পরোক্ষ প্রমাণের ভিত্তিতেই 'আদম-হাওয়া' ধরনের বিশ্বাস-নির্ভর সৃষ্টিতত্ত্বকে হটিয়ে তা বিজ্ঞানের জগতে এখন স্থায়ীভাবে জায়গা করে নিয়েছে।

যা হোক, আবার আমরা গুপ্ত পদার্থের জগতে ফিরে যাই। কি ভাবে জানা গিয়েছিল এই অদৃশ্য পদার্থের অস্তিত্ব?

ভেরা রুবিন (১৯২৮ -)

এই ঘটনাটি বলতে গেলে ভেরা রুবিনের কথা বলতেই হয়। তিনিই সর্বপ্রথম আমাদের ছায়াপথ আর অন্যান্য সর্পিলাকার গ্যালাক্সিগুলোতে ডার্ক ম্যাটারের অস্তিত্বকে অত্যন্ত জোড়ালো ভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। মূলতঃ রুবিনের কাজই পরবর্তীতে টনি টাইরণের মত জ্যোতির্বিদদের গুপ্ত পদার্থের বিষয়ে গবেষণায় আগ্রহী করে তুলে। ব্যাপারটি একটু ব্যাখ্যা করা যাক।

আমাদের গ্যালাক্সির কেন্দ্র থেকে অনেক দূরবর্তী নক্ষত্ররাজির গতিবেগ কেন্দ্রের কাছাকাছি অবস্থিত নক্ষত্ররাজির বেগের তুলনায় কম হওয়ার কথা; ঠিক যেমনটা ঘটে আমাদের সৌরজগতের ক্ষেত্রে। সূর্য থেকে যত দুরে যাওয়া যায়- গ্রহগুলোর গতিবেগও সেই হারে কমতে থাকে। কারণটা খুবই সোজা। নিউটনের সুত্র থেকে আমরা জেনেছি

যে, মাধ্যাকর্ষণ বলের মান দুরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক। মানে দুরত্ব বাড়লে আকর্ষণ বলের মান কমবে তার বর্গের অনুপাতে। টান কম হওয়ার জন্যই দূরবর্তী গ্রহগুলো আস্তে ঘোরে। আমাদের ছায়াপথের ক্ষেত্রেও ঠিক একই রকম ঘটনা ঘটবার কথা। কেন্দ্র থেকে দূরবর্তী নক্ষত্রগুলো তাদের কক্ষপথে কেন্দ্রের কাছাকাছি নক্ষত্রগুলোর চেয়ে আস্তে ঘুরবার কথা। কিন্তু রুবিন যে ফলাফল পেলেন তা এক কথায় অবিস্মরনীয়। দূরবর্তী নক্ষত্রগুলোর ক্ষেত্রে গতিবেগ কম পাওয়া গেলই না বরং একটা নির্দিষ্ট দূরত্বের পর সকল নক্ষত্রের গতিবেগই প্রায় একই সমান পাওয়া গেল। অন্যান্য সর্পিলাকার গ্যালাক্সি গুলো (যেমন অ্যান্ড্রোমিডা) পর্যবেক্ষণ করেও রুবিন সেই একই ধরনের ফলাফল পেলেন। তার এই পর্যবেক্ষণ জ্যোতির্বিদদের ভাবনায় ফেলল। হয় রুবিন কোথাও কোন ভুল করছেন, অথবা এই গ্যালাক্সির প্রায় পুরোটাই এক অজ্ঞাত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পদার্থে পূর্ণ। রুবিন যে ভুল করছেন না এই ব্যাপারটা আরো ভালোভাবে বোঝা গেল অ্যান্ড্রোমিন্ডা গ্যালাক্সি পর্যবেক্ষণ করে। দেখা গেল ২২ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরের এই গ্যালাক্সিটি ঘন্টায় প্রায় ২ লক্ষ মাইল বেগে আমাদের দিকে ছুটে আসছে। এই অস্বাভাবিক গতিবেগকে মহাকর্ষ জনিত আকর্ষণ দিয়েই কেবলমাত্র ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু দৃশ্যমান পদার্থ তো পরিমানে অনেক কম - ফলে মহাকর্ষের টান তো এত ব্যাপক হবার কথা নয়! তাহলে? তাহলে কোথাও নিশ্চয়ই বিশাল আকারের অদৃশ্য পদার্থ এই দুই গ্যালাক্সির মাঝে লুকিয়ে আছে। বিশাল আকার যে কতটা বিশাল তা বোধ হয় অনুমান করা যাচ্ছে না। এই অদৃশ্য পদার্থের আকার আমাদের যে ছায়াপথ সেই 'মিল্কিওয়ে' এর মোটামুটি দশ গুন!

গুপ্ত পদার্থ আছে - তা না হয় বোঝা গেল - কিন্ত কেমনতর এই পদার্থগুলো? এদের বৈশিষ্ট্যই বা কি রকম? সত্যি বলতে কি - আমরা এখনও তা বুঝে উঠতে পারিনি। গুপ্ত পদার্থগুলোয় নিশ্চিতভাবে কোন ঝলমলে নক্ষত্র নেই - থাকলে তো আর তারা গুপ্ত (Dark) থাকত না। এতে ধূলি কণাও (dust grain) থাকতে পারবে না - কেন না এই ধূলি কণা গুলো দূরবর্তী গ্যালাক্সি থেকে আগত আলোকে আটকে দেবার জন্য এবং সেই সাথে আমাদের চোখে ধরা পড়বার জন্য যথেষ্টই বড়। তা হলে কি আছে এতে? আসলে বিজ্ঞানীরা যে তত্ত্ব দিয়েছেন তা যদি সত্যি হয়ে থাকে, গুপ্ত পদার্থগুলো আমাদের চেনা জানা কোন পদার্থ দিয়েই তৈরী হওয়ার কথা নয়। সে জন্যই তারা রহস্যময় এবং গুপ্ত। কৃষ্ণ গহবর আর নিউট্রিনোগুলো এর একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হতে পারে অবশ্য। বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করে যাচ্ছেন যতদূর সম্ভব এদের সম্বন্ধে জেনে সঠিক ধারণায় পৌঁছুতে কারণ মহাবিশ্বের প্রাথমিক অবস্থার সাথে তাদের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ট।

আরেকটি কারণেও ডার্ক ম্যাটার গুরুত্বপূর্ণ। সেই যে ওমেগার ব্যাপারটা। বিজ্ঞানীরা ভাবছেন যে, এই মহাবিশ্বের প্রায় ৯৯ ভাগ পদার্থই গুপ্ত পদার্থ হতে পারে। তাই যদি

হয়, তবে মহাশূণ্যের বিশাল এলাকা আসলে সেই অর্থে 'শুন্য' নয়; মহাবিশ্ব আসলে হতে পারে এই অদৃশ্য গুপ্ত পদার্থের এক অথই মহাসমুদ্র - আর দৃশ্যমান পদার্থগুলো তার মাঝে নগন্য কয়েকটি আলোকিত 'দ্বীপ-মালা'। এই ব্যাপারটা সত্য হলে কিন্তু ওমেগার মান ১ এর চেয়ে বড় হয়ে যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে এক সময় মহাবিশ্বের প্রসারণ বন্ধ হয়ে শুরু হবে সংকোচন।

মহাবিশ্ব সংকুচিত হতে থাকলে কি হবে? যখন সংকোচনের পালা আসবে, আশেপাশের গ্যালাক্সি গুলোর দিকে তাকালে তখন আর লোহিত সরণ দেখা যাবে না, দেখা যাবে নীলাভ সরণ (Blue Shift)। নিজেদের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়তে থাকায় পদার্থের ঘনত্ব আর তাপমাত্রা ক্রমশঃ বাড়তে থাকবে। তারপর, যে সময়টা ধরে একসময় মহাবিশ্ব প্রসারিত হয়েছিল সেই একই সময় খরচ করে আবার অদ্বৈত বিন্দুতে ফিরে যাবে (নীচের ছবি a)। মহাবিশ্বের এই অন্তিম পতনের নাম দেওয়া হয়েছে মহাসংকোচন (Big Crunch)। অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন মহাবিস্ফোরণ আর মহাসংকোচনের মাঝে আজীবন দুলতে (Oscillate) থাকাও মহাবিশ্বের পক্ষে অসম্ভব নয়। যেমন, এ সময়কার অন্যতম খ্যাতিমান পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং এমন একটি সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে বলেছেন- এই দোদুল্যমান মহাবিশ্ব (Oscillating Universe) যে অদ্বৈত বিন্দুর (Singularity point) থেকেই শুরু বা তাতে গিয়ে শেষ হতে হবে -এমনটি ভাবার কোন কারণ নেই। সংকুচিত হতে হতে অন্তিম পতনের আগ মুহূর্তে কোন এক ভাবে যথেষ্ট পরিমান চাপ সৃষ্টি হয়ে মহাকর্ষের টানকে অতিক্রম করবার মত যথেষ্ট শক্তি অর্জিত হবে যা ধাক্কা দিয়ে মহাবিশ্বকে আরেকটি প্রসারণের চক্রে ঠেলে দিবে। তার মানে মহাবিশ্বের ওইরকম কোন পরিসমাপ্তি ঘটবে না - বরং 'বাউন্স' করবে (ছবি b)।

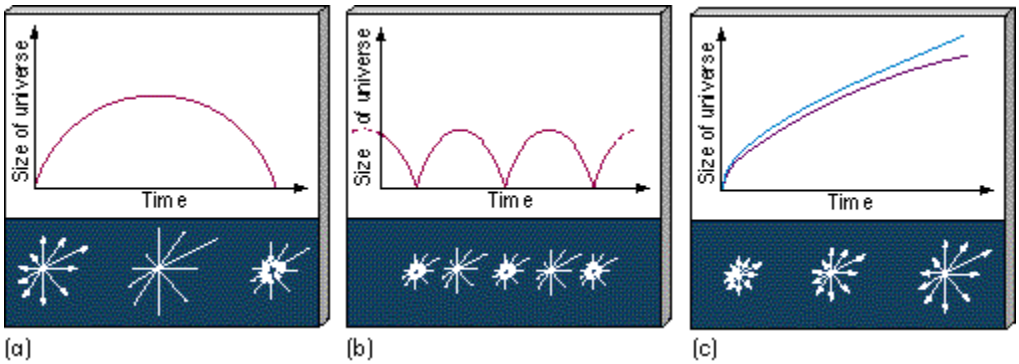

(a) *A high-density universe has a beginning, an end, and a finite lifetime. The lower frames illustrate its evolution, from explosion to maximum size to recollapse.* ***(b)*** *An oscillating universe has neither a beginning nor an end. Each expansion—contraction phase ends in a "bounce" that becomes the "Big Bang" of the next expansion. There is currently no information on whether this can actually occur.* ***(c)*** *A low-density universe expands forever from its explosive beginning. The upper*

curve represents a universe with density less than the critical value. The lower curve represents a universe with density exactly equal to the critical value.

এ ধরনের বাউন্স হয়ত চলতে থাকবে অনন্ত কাল ধরে। তবে এধারণাগুলো স্রেফ তত্ত্বকথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। জোড়ালো কোন প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। মহাবিস্ফোরণের পক্ষে জোড়ালো প্রমাণ পাওয়া গেছে অনেক আগেই - কিন্তু মহাসংকোচনের ব্যাপারটা কিন্তু অনেকটাই অনিশ্চিত; মহাসংকোচন একটা হাইপোথিসিস মাত্র - আর সেই হাইপোথিসিসকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য (ওমেগা = ১) যে পরিমান পদার্থ মহাবিশ্বে থাকা প্রয়োজন তার মাত্র একশ ভাগের এক ভাগ পদার্থের এ পর্যন্ত 'দেখা' মিলেছে।

মহাশুন্যের জ্যামিতি যদি সামতলিক হয়, আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুযায়ী মহাবিশ্বের প্রসারণ ধীরে ধীরে হ্রাস পাওয়া উচিৎ। মহাবিশ্বের মোট শক্তি তার মহাকর্ষের বদৌলতে ক্রমশ প্রসারণকে স্তিমিত করে আনবে এটাই স্বাভাবিক। একটা পাথরকে উপরের দিকে ছুড়ে দিলে যত উপরে উঠে ততই এর বেগ কমতে থাকে মাধ্যাকর্ষনের টানে। সেরকমই ব্যাপার অনেকটা। এ পর্যন্ত সব কিছু ঠিক-ঠাকই ছিল। কিন্তু গোল বাঁধালো ১৯৯৮ সালের একটা ঘটনা। সুপারনোভা বিস্ফোরণ নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে একদল বিজ্ঞানী যে ফলাফল পেলেন তা এক কথায় অবিশ্বাস্য। বিজ্ঞানীদের ধারণা উলটে দিয়ে দেখা গেল মহাবিশ্বের প্রসারণ আসলে হ্রাস পাচ্ছে না, বরং ত্বরান্বিত হচ্ছে। ১৯৯৮ সালের এই পর্যবেক্ষণটিকে পদার্থবিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ আবিস্কারগুলোর অন্যতম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ব্যাপারটা সেসময় বিজ্ঞানী সমাজে এতটাই আলোড়ন তুলেছিল যে এই ব্যাপারটা 'ত্বরিত মহাবিশ্ব' (Accelerating Universe) শিরোনামে বেশ কিছুদিন ধরে পত্র-পত্রিকায় প্রথম পাতার খবর হয়েছিল।

মহাবিশ্বের এই ত্বরণের পিছনে রয়েছে মহাকর্ষ-বিরোধী এক ধরনের 'গুপ্ত শক্তি' (Dark energy) - অন্তত বিজ্ঞানীদের তাই ধারণা। এই গুপ্ত শক্তির ধরণ-ধারণ গুপ্ত পদার্থের চেয়েও বেশী রহস্যজনক। এই শক্তির বৈশিষ্ট্য এখনও বিজ্ঞানীদের কাছে অজানা - কিন্তু এটা ইতিমধ্যেই বোঝা গেছে যে, গুপ্তশক্তি আমাদের মহাবিশ্বের এক প্রধানতম উপাদান। আসলে বিশ শতকের শুরুতেই আপেক্ষিক তত্ত্বের মাধ্যমে আলবার্ট আইনস্টাইন মহাকর্ষ-বিরোধী বলের (Anti-Gravitational force) একটা ধারণা করেছিলেন। মহাকর্ষের প্রভাবে পদার্থসমূহের অবশ্যাম্ভাবী পতন এড়াতে আর সেই সাথে মহাবিশ্বকে একটা স্থিতিশীল রূপ দিতে তার সমীকরণগুলোতে আইনস্টাইন Cosmological Constant নামে একটা কাল্পনিক ধ্রুবক যোগ

করেছিলেন। কিন্তু হাবলের আবিস্কারে যখন প্রমানিত হল যে এই মহাবিশ্ব স্থিতিশীল নয় -বরং প্রসারনশীল - তখন আইনস্টাইন নিজেই ঘোষনা করেছিলেন যে, Cosmological Constant টা ছিল তার জীবনের সবচাইতে বড় ভুল (Greatest Blunder)। এই ব্যাপারটা নিয়ে চতুর্থ পর্বে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছিল।

মনে হচ্ছে যে, আইনস্টাইনের সেই মস্ত বড় ভুলেরও ভুল ধরিয়ে দিয়ে এই একুশ শতকে অ্যান্টি-গ্র্যাভিটি আবার নতুন উদ্যমে ফিরে এসেছে। কিন্তু এই অ্যান্টি-গ্র্যাভিটি ব্যাপারটা কি? ব্যাপারটা একটু খুলে বলি। শুন্য স্থানেও (vacuum) শক্তি লুকিয়ে থাকতে পারে আর তার চাপ হবে ঋণাত্মক। ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত শোনাচ্ছে। শুন্যতায় আবার শক্তি কি রকম? আর ঋণাত্মক চাপের অর্থই বা কি? আসলে আধুনিক পদার্থবিদ্যায় শুণ্যতাকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হয়। যেখানে কোন পদার্থ নেই সেখানেও কিছুটা শক্তি থাকতে পারে। যে শুন্যদেশকে আপাতদৃষ্টিতে শান্ত, সমাহিত ভাবা হচ্ছে, তার মধ্যেও সূক্ষস্তরে ঘটে চলেছে নানা প্রক্রিয়া। শুন্যতার মাঝে নিহিত শক্তি থেকে পদার্থকণা স্বতস্ফুর্ত ভাবে তৈরী হচ্ছে আবার তারা নিজেদেরকে ধবংস করে শক্তিতে বিলীন করে দিচ্ছে। 'স্বতঃস্ফুর্ত' শব্দটা ইচ্ছে করেই এখানে ব্যবহার করলাম। অনেকেই ঢালাও ভাবে ভেবে থাকেন যে, কারণ ছাড়া কোথাও কিছুই ঘটে না আর সৃষ্টিকর্তা ছাড়া কিছু সৃষ্টও হতে পারে না। ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশনের (vacuum flactuation) মাধ্যমে পদার্থ আর প্রতি-পদার্থ উৎপন্ন হওয়ার ব্যাপারটি কিন্তু একেবারেই এই ধারণার বিরোধী। এখানে স্রেফ 'শুন্য থেকে' পদার্থ তৈরী হচ্ছে কোন কারণ ছাড়াই (uncaused) এবং স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে (spontaneously)। এই ব্যাপারটি নিয়ে পরবর্তী পর্বে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।

আর ঋণাত্মক চাপের অর্থ কি? আসলে ঋণাত্মক চাপযুক্ত কোন বস্তু বাইরের দিকে চাপ দেবে না, ভিতরের দিকে কুঁকড়ে যেতে চাইবে। যেমন- যারা গিটার বাজায় তারা জানে যে, গিটারে তারগুলিকে জোড়ে টেনে রাখা হয় বলে এরা সবসময় ছোট হওয়ার চেষ্টা করে আর গিটারের বাহুকে বাঁকিয়ে ফেলতে চায়। এখানে গিটারের তারের চাপ কিন্তু ঋণাত্মক। যদিও উপরের উদাহরনটা খুব একটা ভাল উদাহরণ নয়, তবুও এই উদাহরণ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ভিতরের দিকে টেনে রাখা কোন বস্তুর মহাকর্ষীয় শক্তি হবে বিকর্ষক। খুবই অবাক করা ব্যাপার। আইনস্টাইন নিজেও খুব অবাক হয়েছিলেন। তাই প্রথমে অংক মেলাবার জন্য cosmological constant কে 'গোনায় ধরলেও' পরে আবার অনর্থক ভেবে বাদ দিয়েছিলেন।

তাহলে বিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণগুলোর সারমর্ম হল, মহাবিশ্বে এক ধরনের শক্তি আছে যার উৎস পদার্থ নয় 'এখনও অজানা' কিছু। এই শক্তি বিকর্ষক ধরনের। ফলে এই শক্তি মহাবিশ্বকে আবদ্ধ রাখতে সহায়তা করছে না, বরং প্রসারণের হার ক্রমশঃ বাড়িয়ে তুলছে। প্রসারণের হার যদি এমনিভাবে বাড়তে থাকে তাহলে শেষ পর্যন্ত মহাবিশ্বের পরিনতি কি হবে? প্রসারণ যদি বাড়তেই তাহলে গ্যালাক্সিগুলো একে অপর থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাবে- আর আলোর উৎসগুলো শক্তিক্ষয় করে একসময় অন্ধকারে ডুবে যাবে; অর্থাৎ মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ আক্ষরিক অর্থেই অন্ধকার!

সম্ভাব্য পরিনতি নিয়ে অতি সম্প্রতি উঠে এসেছে আরেকটি নতুন তত্ত্ব। ডার্ট মাউথ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক রবার্ট ক্লাডওয়েল মনে করেন ২০০০ কোটি বছরের মধ্যে প্রসারণ এতই বেড়ে যাবে যে, এটা আক্ষরিক অর্থেই তা গ্যালাক্সিগুলোকে একসময় টেনে ছিঁড়ে ফেলবে; ছিঁড়ে ফেলবে নক্ষত্রকে, ছিঁড়ে ফেলবে গ্রহদের, ছিঁড়ে ফেলবে আমাদের সৌরজগৎকে আর শেষ পর্যন্ত ছিঁড়ে ফেলবে সমস্ত পদার্থকে। এমনকি পরমানু পর্যন্ত ছিঁড়ে যাবে অন্তিম সময়ের $১০^{-১৯}$ সেকেন্ড আগে। তবে এই মহাচ্ছেদন (Big Rip) সত্যই ঘটবে কিনা -শুধুমাত্র ভবিষ্যত গবেষণা থেকেই এটা সঠিকভাবে জানা সম্ভব।

অনেকেই ভাবেন বিগব্যাং এর তত্ত্ব প্রমাণিত হওয়ার সাথে সাথেই ঈশ্বর জাতীয় কোন কিছুর অস্তিত্ব বোধ হয় বিজ্ঞান স্বীকার করে নিয়েছে। এই ব্রহ্মান্ডের যেহেতু শুরু আছে - অতএব 'পরম পিতা' জাতীয় কেউ না কেউ আছেন যিনি এই বিগব্যাং পরিচালনা করেছেন, আর এখন বসে বসে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন। সব কিছুই তাঁর মহান এক পরিকল্পনার অংশ। এই ধারণাটি শুধু সাধারণ মানুষের মধ্যেই আজ সীমাবদ্ধ নয়, ধারণাটিকে জনপ্রিয় করার কাজে প্রচার মাধ্যম এবং মুষ্টিমেয় কিছু 'বিশ্বাসী' বিজ্ঞানীও মাঠে নেমে পড়েছেন। যেমন, খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত পদার্থবিদ হুগ রস (Hugh Ross) তাঁর The Creator and the Cosmos বইয়ে বলেন -

> If the universe arose out of a big bang, it must have had a beginning. If it had a beginning, it must have a beginner *(সুত্র : Hugh Ross, The Creator and the Cosmos (Colorado Springs: Navpress, 1995), p. 14.)*

আবার মুসলিম সমাজে ইদানিং জনপ্রিয় হয়ে ওঠা দার্শনিক হারুন ইয়াহিয়া তাঁর একটি প্রবন্ধে বলেন -

> Scientists are now certain that the universe came into being from nothingness as the result of an unimaginably huge explosion, known as the **"Big Bang"**. In other words, the universe came into being-or rather, it was created by Allah. *(সূত্র : The Creation of the Universe, Introduction, The Scientific Collapse of Materialism http://www.harunyahya.com/create01.php)*

কিন্তু সত্যই কি তাই? বিজ্ঞান কি সত্যই এরকম কোন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে পেয়ে গেছে? এই ব্যাপারটা নিয়ে এই সিরিজের শেষ পর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে। তবে এ নিয়ে আলোচনা করতে হলে বিজ্ঞানের পাশাপাশি দর্শনের জগতেও আমাদের আমাদের পা রাখতে হবে। তার আগে স্ট্রিং তত্ত্ব সম্বন্ধেও আমাদের একটু ভাল করে জানা দরকার।

৬ষ্ঠ পর্ব...

আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী -৬

অভিজিৎ রায়

www.mukto-mona.com

এই পর্বটি আসলে লেখা হয়েছিল 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' সিরিজটি শেষ হওয়ার বেশ কিছুদিন পর। সরিজটি মুক্ত-মনায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের পর কিছু পাঠক আমাকে ই-মেইল করে জানিয়েছিলেন যে, আমি আমার সিরিজে স্ট্রিং তত্ত্বের উপর তেমনভাবে আলোকপাত করিনি। কথাটি সত্যি। এই যুগান্তকারী তত্ত্বের উল্লেখ তখন তেমনভাবে করা হয়নি ইচ্ছে করেই। স্ট্রিং তত্ত্ব বিজ্ঞানের জগতে একেবারেই নতুন। অনেক কিছুই এখনো পরীক্ষা নিরীক্ষা আর অনুমানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই তত্ত্বের বিশদ জানতে হলে আমাদের আরো বেশ কিছুটা সময় ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে, ভুল ভ্রান্তির পর্দা সরিয়ে মূল নির্যাসটুকু পাওয়ার জন্য। এর মধ্যে আমার 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' সিরিজটি মুক্ত-মনা প্রকাশনীর পক্ষ থেকে বই আকারে প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছেন আমার শুভানুধ্যায়ীরা। আমার মত সাধারণ লেখকের জন্য এ অত্যন্ত আনন্দের এবং গর্বের ব্যাপার। স্ট্রিং তত্ত্ব নিয়ে লেখাটি ৬ষ্ঠ পর্ব হিসেবে জুড়ে দিলাম, আর আগের লেখা ৬ষ্ঠ পর্বটিকে পাঠিয়ে দিতে হল সপ্তমে। পাঠকদের কাছ থেকে গঠনমূলক সমালোচনা প্রত্যাশা করছি।

অভিজিৎ
ইমেইল ঃ avijit@mukto-mona.com

১৬/০৪/০৪

পূর্ববর্তী পর্বের পর হতে...

আইনস্টাইনের সময় বিজ্ঞানীরা দুর্বল ও সবল নিউক্লিয় বলের কোন হদিস পাননি। আইনস্টাইনের মূল ভাবনা ছিল তাই মহাকর্ষ এবং তড়িচ্চুম্বক বলকে ঘিরে। তিনি এই দুটি বলকে একটিমত্র সূত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করবার লক্ষ্যে জীবনের শেষ ত্রিশ বছর ধরে প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। এই সেই তথাকথিত একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্ব বা 'Unified field

theory’ যার মাধ্যমে আইনস্টাইন স্বপ্ন দেখেছিলেন প্রকৃতিজগতের বলগুলোকে একটিমাত্র সূতায় গাঁথতে। কিন্তু আইনস্টাইন আজীবন চেষ্টা করেও এই ‘বিনি সূতার মালাখানি’ গাঁথতে পারলেন না, বরং তার স্বপ্ন পূরণের উচ্চাভিলাসী পরিকল্পনা তাঁকে জীবনের শেষ বছরগুলোতে এক ‘নিঃসঙ্গ গ্রহচারী’তে পরিনত করে। শধু এই একটি বিষয়ে নিজের সমস্ত মেধা ও শক্তি নিয়োগ করায় পদার্থবিজ্ঞানের তৎকালীন মূলধারার গবেষণা থেকে তিনি ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিলেন। আইনস্টাইন যে ব্যাপারটি বুঝতে পারেন নি তা নয়। ১৯৪২ সালে তার এক বন্ধুকে লেখা চিঠিতে আইনস্টাইন বললেন,

> ‘আমি একজন বৃদ্ধ কিশোরে পরিণত হয়েছি, যিনি এখন মোজা পরেন না বলে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন এবং বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে একধরনের ‘কৌতুহলী দ্রষ্টব্য’ হিসেবে প্রদর্শিত হন।’ *(সূত্রঃAlbert Einstein, 1942 letter to a friend, as quoted in Tony Hey and Patrik Walters, Einstein's Mirror, Cambridge, Eng.: New York: Pantheon, 1992)*

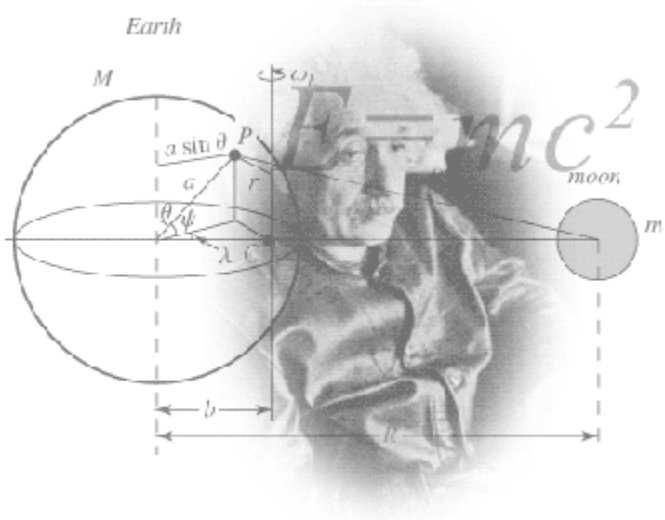

আসলে আইনস্টাইন তার সময়ের চেয়ে আনেক আগ্রগামী ছিলেন। আইনস্টাইনের সময় যে ব্যাপারটিকে স্রেফ ‘উচ্চাভিলাসী স্বপ্ন’ বলে মনে হয়েছিল, আজ অর্ধশতাব্দীরও বেশী সময় পর সেই স্বপ্নটিকেই পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণার সবচাইতে শক্তিশালী স্রোতধারা হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

কয়েক দশক আগে গ্লাসো, সালাম আর ভাইনবার্গ মিলে তড়িচ্চুম্বক আর দুর্বল পারমানবিক বলকে একসূত্রে গাঁথলেন -আইনস্টাইনের লালিত স্বপ্নের প্রাথমিক একটি ধাপ সম্পন্ন হল। স্বপ্নের পরবর্তী ধাপ অর্থাৎ, ‘দুর্বল তড়িৎ’, ‘সবল নিউক্লিয়’ এবং মহাকর্ষ এই বল তিনটিকে এক করবার মত উপযুক্ত তত্ত্ব যদিও এখনো পাওয়া যায়নি, কিন্তু, ‘নন-গ্র্যাভিটেশনাল বল’ তিনটিকে (দুর্বল, সবল এবং তড়িচ্চুম্বক) কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সাহায্যে একটিমাত্র বোধগম্য ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে অনেক আগেই। চতুর্থ বল অর্থাৎ মহাকর্ষকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে সবচাইতে যে আলোচিত তত্ত্ব - আপেক্ষিকতার ব্যাপক (সাধারণ) তত্ত্ব - তাকে কিন্তু আলোচনার বাইরেই রাখতে হচ্ছে এই মুহূর্তে। কারণ আপেক্ষিকতার ব্যাপক তত্ত্বটি একটি চিরায়ত তত্ত্ব (Classical theory), কোনমতেই কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সম্ভাবনার জগতের

সাথে খাপ খায় না; আর খাপ খায়না বলেই যত উটকো ঝামেলা আর বিরোধের উৎপত্তি। আধুনিক পদার্থবিদ্যার একটি প্রাথমিক লক্ষ্য এই মুহূর্তে আপেক্ষিকতার ব্যাপক তত্ত্ব (General Theory of Relativity) এবং কোয়ান্টাম তত্ত্বের (Quantum theory) ভিতরকার অনাকাঙ্ক্ষিত বিরোধ মিটিয়ে ফেলা। তাত্ত্বিক পদার্থবিদরা চেষ্টা করেছেন ঢের, কিন্তু ব্যাপারটি তাদের জন্য মোটেও সহজ হয়নি। আসলে আপেক্ষিকতার ব্যাপক তত্ত্ব আর কোয়ান্টাম বলবিদ্যা বস্তু জগতের উপর সম্পূর্ণ আলাদাভাবে কাজ করে। বিজ্ঞানীরা সম্মিলিত সমীকরণের (Combined Equation) সাহায্যে আপেক্ষিক তত্ত্ব এবং কোয়ান্টাম বলবিদ্যাকে এক সূত্রে গাঁথার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, কিন্তু এ ধরনের প্রচেষ্টায় প্রায় ক্ষেত্রেই একটিমাত্র উত্তর বেরিয়ে আসে - Infinity। সমস্যা এটাই। পদার্থবিদদের কাছে এই উত্তর একটি অবোধ্য কবিতা - ননসেনস রাইম। কারণ ব্যবহারিক পদার্থবিদরা অসীমতা বা ইনফিনিটিকে কোনভাবেই মাপতে পারেন না। আমাদের চিরচেনা বস্তুজগৎ কাজ করে সসীম মাত্রায় - তা সে মোটরগাড়ীর গতিই হোক আর ইলেকট্রনের ঘূর্ণনই হোক। তাই সমীকরণ থেকে প্রাপ্ত উত্তর - 'ইনফিনিটি' পদার্থবিদদের হতাশ করে, স্তিমিত করে। আইনস্টাইনের স্বপ্নের 'সোনার কাঠি' বুঝি অধরাই থেকে যায়।

অনেক পাঠক হয়ত ভাবতে পারেন, আপেক্ষিক তত্ত্ব আর কোয়ান্টাম তত্ত্বের মধ্যে যখন এতই বিরোধ, তা না মিটালেই বা এমন কি ক্ষতি? সব বিরোধ যে সব সময় মিটাতে হবে তারও তো কোন কথা নেই; বিরোধ থাকলে কীই বা এমন যায় আসে? হ্যা, ব্যাপারটা সত্যিই; হতে পারে সম্মিলিত সমীকরণগুলো 'অর্থহীন' ফলাফল হাজির করছে, কিন্তু সমীকরণগুলো তো একসাথে কখনই ব্যবহৃত হয় না। বহুবছর ধরে জ্যোতির্পদার্থবিদরা দেখেছেন - স্থুল জগতের (macro world) বর্ণনায় অর্থাৎ, গ্রহ তারকামন্ডল, নিহারীকার বিচলন, এমনকি সমস্ত মহাবিশ্বের প্রসারণে আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব অত্যন্ত সাফল্যের সাথে বিগত সময়গুলোতে ব্যবহৃত হয়েছে, ঠিক একইভাবে আনুবীক্ষনিক জগতের (micro world) বর্ণনায়, মানে অণু পরমাণু ও কণিকার জগতে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সূত্রাবলী ব্যবহৃত হয়েছে নিখুঁত সৌন্দর্যে। যেহেতু আপেক্ষিক তত্ত্ব আর কোয়ান্টাম তত্ত্ব দুইই তাদের নিজস্ব পরিমন্ডলে অত্যন্ত সফল, কেন অযথা তাদের একীভূত করার প্রচেষ্টা? তাদের আলাদা রাখলেই তো হয়। আপেক্ষিক তত্ত্বকে বৃহৎ বস্তুরাজির জগতে আর কোয়ান্টাম বলবিদ্যাকে অতিক্ষুদ্র বস্তুকণার জগতে আলাদাভাবেই বরং প্রয়োগ করি না কেন! সমস্যাটা কি?

না সমস্যা নেই। সত্যি বলতে কি, বিজ্ঞানীরা এতদিন ধরে এভাবেই কাজ করেছেন, মানে সূত্রদুটিকে আলাদা ভাবে প্রয়োগ করেছেন। আর অস্বীকার করার জো নেই, এভাবে আলাদা আলাদাভাবে প্রয়োগ 'অত্যন্ত সফল' বলে প্রমাণিতও হয়েছে; আর মানবজাতিও উপকৃত হয়েছে স্বীয় পরিমন্ডলের নান্দনিক সৌন্দর্যে। কিন্তু এত কিছুর পরও তাত্ত্বিক পদার্থবিদরা মনে করেন, আপেক্ষিক তত্ত্ব আর কোয়ান্টাম তত্ত্বের বিরোধ মেটানো জরুরী। এর কারণ মূলতঃ দুটি।

প্রথমতঃ GUT লেভেলে পদার্থবিজ্ঞানের দুটি শক্তিশালী বিচরণক্ষেত্রকে আলাদা করা যাচ্ছে না - এই ব্যাপারটি বিজ্ঞানীদের জন্য একই সাথে অবিশ্বাস্য এবং অস্বস্তিকর। ওই স্তরে নেমে আসলে ব্যাপারটা আর এমন থাকে যে, কিছু ঘটনাকে আপেক্ষিকতার সাহায্যে আর কিছু ঘটনাকে কোয়ান্টাম সূত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করে দায়িত্ব শেষ করা যায়। আর তাছাড়া বিজ্ঞানীরা মনে করেন, সামগ্রিকভাবে বিশ্বজগতকে দুটি আলাদা পরিমন্ডলে ভাগ করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা কৃত্রিম এবং অনভিপ্রেত। কোয়ান্টাম আর আপেক্ষিক তত্ত্বের বিরোধ থেকে যাওয়া মানে আসলে বস্তুজগৎ সম্বন্ধে আমাদের অর্জিত জ্ঞান এখনো অপর্যাপ্তই রয়ে গেছে বলে বুঝতে হবে। তারা মনে করেন যে, দীর্ঘদিনের এই বিরোধ মিটলে আমাদের এই চিরচেনা প্রকৃতিজগতকে স্রেফ একটিমাত্র সূত্রের সাহায্যে (সেই যে তথাকথিত Theory of Everything সংক্ষেপে T.O.E) ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

দ্বিতীয়তঃ বড় বড় বস্তুর ক্ষেত্রে আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব, আর ছোট বস্তুকণার ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার আলাদা প্রয়োগের ব্যাপারটি সবসময় সমানভাবে কার্যকরী নয়। কৃষ্ণ গহবর (Black Hole) এক্ষেত্রে খুব ভাল উদাহরণ। আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব থেকে আমরা জানছি, কৃষ্ণ গহবরের আভ্যন্তরীণ পদার্থসমূহ ঘন সন্নিবদ্ধ হয়ে গহবরের কেন্দ্রে একটি ক্ষুদ্র বিন্দুতে বিলীন হয়। এই আকর্ষনীয় ব্যাপারটা কৃষ্ণ গহবরের কেন্দ্রকে একই সাথে বৃহদাকার (ভর বিশিষ্ট) এবং ক্ষুদ্রাকার (আয়তন বিশিষ্ট) সত্ত্বায় পরিণত করেছে। আপেক্ষিকতার ব্যাপক তত্ত্ব প্রয়োগের ব্যাপারটা আসছে বৃহৎ ভরের কারণে সৃষ্ট মহাকর্ষ ক্ষেত্রকে সামলাতে, আর কোয়ান্টাম বলবিদ্যার ব্যাপারটা গোনায় ধরতে হচ্ছে কৃষ্ণ গহবরের অত্যন্ত ঘন সন্নিবেশিত ক্ষুদ্রায়তনের জন্য। কিন্তু সম্মিলিত সমীকরণগুলো এই বিশেষ অবস্থায় প্রয়োগ করতে গিয়ে দেখা গেছে যে, এই বিশেষ অবস্থায় তারা ভেঙে পড়ে, ফলে কৃষ্ণ গহবরের কেন্দ্রে ঠিক কি হচ্ছে আমরা আজো তা পরিস্কারভাবে বুঝে উঠতে পারি নি।

বোঝা যাচ্ছে যে, আপেক্ষিক তত্ত্ব আর কোয়ান্টাম বলবিদ্যার মিলনের ব্যাপারটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তবে গুরুত্বের মাত্রাটা আরও বেশী অন্য জায়গায়। তত্ত্ব দুটির মধ্যে বিরোধ থাকার অর্থ হল আমাদের মহাবিশ্বের শুরুর দিকের ঘটনাবলী বুঝার ক্ষেত্রে সবসময়ই এটি একটি বিশাল অন্তরায় হয়ে রইবে। কারণটা বোঝা মোটেও কষ্টকর নয় :

আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি যে, প্রায় ১৫০০ কোটি বছর পূর্বে এক ঘন সন্নিবেশিত অদ্বৈত বিন্দু (Singularity point) থেকে এক মহাবিস্ফোরণের (Big Bang) মাধ্যমে আমাদের এই মহাবিশ্বের উৎপত্তি। বিশ্বব্রহ্মান্ডের প্রাথমিক অবস্থাটা তা হলে অনেকটা কৃষ্ণগহবরের কেন্দ্রের মতই দাঁড়াচ্ছে। প্রাথমিক মহাবিশ্বের বিশাল ঘন অবস্থাটিকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যার জন্য দরকার আপেক্ষিকতার ব্যাপক তত্ত্বের আবার মহাবিশ্বের সে সময়কার অতি ক্ষুদ্র আয়তন দাবী করে

বসে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা প্রয়োগের। কিন্তু আগের মতই আমরা দেখছি যে একীভূত সমীকরণকে এই বিশেষ অবস্থায় এসে ভেঙে পড়তে। কোয়ান্টাম বলবিদ্যা আর আপেক্ষিক তত্ত্বের বিরোধের কারণে মহাবিশ্বের প্রাথমিক নিয়ামক সম্বন্ধে আমরা এখনো অজ্ঞই থেকে যাচ্ছি। বিজ্ঞানীরা তাই মনে করেন, মহাবিশ্বের শুরুর দিককার ঘটনাবলী সঠিকভাবে বুঝতে হলে আপেক্ষিক তত্ত্ব আর কোয়ান্টাম তত্ত্বের বিদ্যমান বিরোধ মেটাতেই হবে। বড় কণিকা আর ছোট কণিকার মধ্যকার 'শ্রেনীগত' বিরোধ মিটিয়ে 'সাম্য' প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই কেবলমাত্র প্রকৃতিজগৎকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব বলে অনেক বিজ্ঞানীই মনে করছেন।

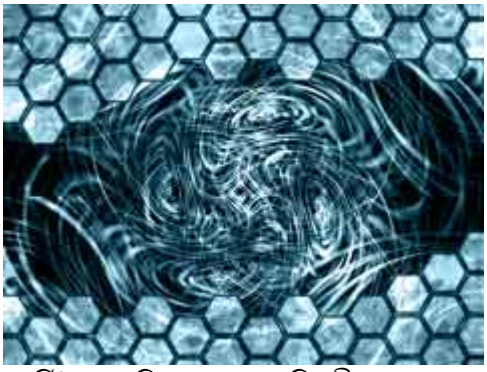

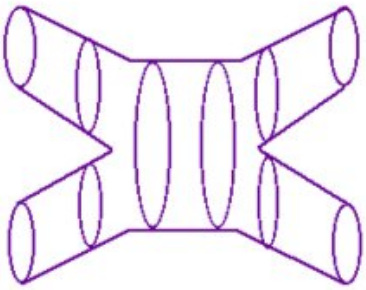

স্ট্রিং এর চিত্ররূপ : ক) শিল্পীর কল্পনায় খ) বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে (ফেইনমেন রেখাচিত্র থেকে)

আর এজন্যই স্ট্রিং তত্ত্ব বিজ্ঞানীদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। স্ট্রিং তত্ত্ব এই মুহূর্তে শুধু কোয়ান্টাম বলবিদ্যা আর আপেক্ষিক তত্ত্বের দীর্ঘদিনের বিরোধ মেটাবার প্রত্যাশা দিচ্ছেই না, বরং সেই সাথে মহাবিশ্বের উৎপত্তির এক অজানা অধ্যায় আমাদের সামনে উন্মোচিত করতে চলেছে। সত্যি কথা বলতে কি, স্ট্রিং তত্ত্বের আবির্ভাব বিজ্ঞানের জগতে অন্য সব আবিস্কারের মত বিজ্ঞানীদের নিরলস প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে গড়ে ওঠেনি বরং 'আবির্ভূত' হয়েছে হঠাৎ করেই, বলা যায় একদম আকস্মিকভাবে। স্ট্রিং তত্ত্বের অন্যতম প্রবক্তা এবং স্ট্রিং বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এডওয়ার্ড উইটেন উদ্বেলিত হয়ে তাই বলে উঠেছেন -

> 'String theory is a part of twenty-first century physics that fell by chance into the twentieth century' (*সূত্রঃ Interview with Edward Witten, May 11, 1992*)

উইটেনের উক্তি হতে বোঝা যায়, আলাদীনের চেরাগের মত হঠাৎ পাওয়া এ তত্ত্বকে পুরোপুরি বুঝতে, আত্মস্থ করে সম্পূর্ণভাবে গড়ে তুলতে কয়েক দশক এমনকি শতকও লেগে যেতে পারে। ব্যাপারটা অতিরঞ্জিত নয়। আসলে এই মুহূর্তে স্ট্রিং তত্ত্বের গাণিতিক অভিব্যক্তিগুলো এতটাই জটিল যে, এর প্রকৃত সমীকরণ কি হবে এ সম্বন্ধে কেউই খুব বেশী নিঃসন্দেহ নন। পদার্থবিজ্ঞানীরা এই মুহূর্তে পুরো সমীকরণ খোঁজা বা সমাধানের চেয়ে বরং 'আসন্ন মনের'

(Approximation) উপর গুরুত্ব দিচ্ছেন। আর বলা বাহুল্য, সে সমস্ত আসন্ন সমীকরণগুলোর প্রকৃতিই এতটা জটিল যে, এখন পর্যন্ত কেবল সেগুলোর আংশিক সমাধান মিলেছে। আরেক জনপ্রিয় স্ট্রিং তাত্ত্বিক ব্রায়ান গ্রীন তাঁর 'The Fabric of Cosmos' বইয়ে স্ট্রিং তাত্ত্বিকদের এখনকার পরিস্থিতিকে এক আদিম উপজাতি কর্তৃক মাটি খুঁড়ে হঠাৎ করে একটি মহাকাশযান (space craft) পেয়ে যাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন। সেরকম একজন মানুষ মহাকাশযানটি দেখে কি করবে? প্রথমে হাত দিয়ে ধরে ছুঁয়ে বুঝতে চাইবে চাইবে ব্যাপারটা কি। তারপর আস্তে আস্তে অনেকটা সময় পেরুলে হয়ত এক সময় উপলব্ধি করবে যে, পুরো মহাকাশযানটি কাজ করে আসলে ভিতরের কিছু বোতাম আর হাতলের সমন্বিত চালনায়। স্ট্রিং তাত্ত্বিকদের এখনকার অবস্থাটা অনেকটা সেই আদিম উপজাতির প্রথমবারের মত মহাকাশযান দেখে হতবিহবল অবস্থার মতই করুণ! প্রতিদিনই তারা জ্ঞানের সোপান বেয়ে উপরের দিকে উঠছেন, অজানাকে জানছেন আর তত্ত্বকে সাধ্যমত সমৃদ্ধ করতে চাইছেন। কিন্তু তাঁদের এই তত্ত্বের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী হতে এবং সার্বিকভাবে ঐক্যমতে পৌঁছুতে এখনো অনেকটা সময় লাগবে।

স্ট্রিং তত্ত্বের মূল ব্যাপারটি নিয়ে এবারে একটু আলোচনা করা যাক; একদম শুরু থেকে। আমরা সকলেই জানি, একটা বস্তুখন্ড তা সে একটা বরফের চাঁই ই হোক আর একটা পাথর খন্ডই হোক, ভেঙে টুকরো করা সম্ভব। আবার সেই টুকরোগুলোকেও ভেঙে আরো ছোট টুকরোয় পরিণত করা যায়। এখন থেকে প্রায় ২৫০০ বছর আগে গ্রীক পন্ডিতেরা এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, টুকরো করতে করতে এমন একটা সময় নিশ্চয়ই আসবে যখন পদার্থকে ভেঙে আরো ছোট টুকরায় পরিনত করা আর সম্ভব হচ্ছে না। তারা পদার্থের এই ক্ষুদ্রত্তম অংশের নাম দিলেন পরমানু বা Atom। তবে এই পরমাণু কিন্তু পদার্থের ক্ষুদ্রত্তম অংশ বা প্রাথমিক কণিকা নয়। আমরা ছেলেবেলায় পদার্থবিদ্যার পাঠ্যপুস্তকে পড়েছি যে, পরমাণুকেও ভাঙা সম্ভব। পরমাণুকে ভাঙলে পাওয়া যায় একটি নিউক্লিয়াসের চারিদিকে পরিভ্রমণ্রত ইলেকট্রনকে। আর নিউক্লিয়াস গঠিত হয় প্রোটন আর নিউট্রনের সমন্বয়ে। বহুদিন পর্যন্ত ইলেকট্রন, প্রোটন আর নিউট্রনকে প্রাথমিক কণিকা মনে করা হত। কিন্তু ১৯৬৪ সালে ক্যালিফোর্ণিয়া ইনসটিটিউট অব টেকনোলজির তাত্ত্বিক পদার্থবিদ মারে গেলম্যান এবং ১৯৬৮ সালে স্ট্যানফোর্ড লিনিয়ার একসিলেটর সেন্টারের বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণে প্রমাণিত হল যে, প্রোটিন ও নিউট্রনগুলো আসলে আরো ক্ষুদ্র কণার সমন্বয়ে গঠিত - যার নাম কোয়ার্ক। তা হলে কোয়ার্ক এবং ইলেকট্রনই হল পদার্থের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সত্ত্বা, যাদেরকে আমরা বলছি ***প্রাথমিক কণিকা***[*]। স্ট্রিং তত্ত্ব কণিকা জগতের পরিচিত এই পরিচিত ছবিকে চ্যালেঞ্জ করে ঘোষনা করছে এই ইলেকট্রন আর কোয়ার্কগুলো আর কিছুই নয় বরং অতি ক্ষুদ্র এক

[*] আসলে এই মুহূর্তে প্রাথমিক কণিকা কেবল কোয়ার্ক এবং ইলেকট্রনই নয়, তালিকায় রয়েছে মিউয়োন(muon) এবং টাউস (taus) নামক দুটি কণিকা যারা মহাবিস্ফোরণ পরবর্তীকালীন মহাবিশ্বেপ্রচু র্পরিমাণে ছিল বলে ধারণা করা হয়। এ ছাড়াও প্রাথমিক কণিকা হিসেবে পাওয়া গিয়েছে নিউট্রিনো (neutrino) - যা ট্রিলিয়ন মাইল পুরু সীসার আস্তরণকে অবলীলায় ভেদ করার ক্ষমতা রাখে।

ধরনের কম্পণশীল তন্তুর (String) কম্পনসৃষ্ট শক্তির এক একটি রূপ। এই তন্তু গুলোর আকার কিন্তু খুবই ছোট (১০$^{-৩৩}$ সেঃমিঃ) - একটি পরমাণু-কেন্দ্রীন বা নিউক্লিয়াসেরও লক্ষ লক্ষ গুন ছোট; এবং এরাই আসলে পদার্থের ক্ষুদ্রত্তম গঠন একক। তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে, উপরে যে সমস্ত প্রাথমিক কনিকার উল্লেখ করা হয়েছে তারা সবই আসলে ১০$^{-৩৩}$ সেঃমিঃ দৈর্ঘ্যের সুতোর বিভিন্ন মাত্রায় কম্পনের ফল ছাড়া আর কিছু নয়। গীটারের একটি তারকে বিভিন্নভাবে আঘাত করলে আমরা যেমন বিভিন্ন মাত্রার শব্দ শুনতে পাই, প্রায় একই রকম ব্যাপার ঘটে স্ট্রিং তত্ত্বের বেলাতেও। তবে স্ট্রিং তত্ত্বের স্ট্রিং গুলো কাঁপলে বিভিন্ন মাত্রার সুরধবনি পাওয়া যায় না, বরং পাওয়া যায় বিভিন্ন ধরণের কণিকা। কণিকাগুলোর ভর, চার্জ, ঘূর্ণন সবকিছুই আসলে নির্ধারিত হয় স্ট্রিং এর কম্পণের বিভিন্ন রকমফেরে। ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে স্ট্রিং এক রকমভাবে কাঁপে, আর কোয়ার্কের ক্ষেত্রে কাঁপে অন্যভাবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, একটিমত্র স্ট্রিং ই বিভিন্ন ভাবে স্পন্দিত হয়ে বস্তুকণার নির্দিষ্ট ভর, নির্দিষ্ট তড়িৎ আধান, নির্দিষ্ট ঘূর্ণন.... এধরনের নানা বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটাচ্ছে। আর এই বৈশিষ্ট্যগুলোই কিন্তু এক ধরনের কণা থেকে আরেক ধরনের কণাকে আলাদা করছে।

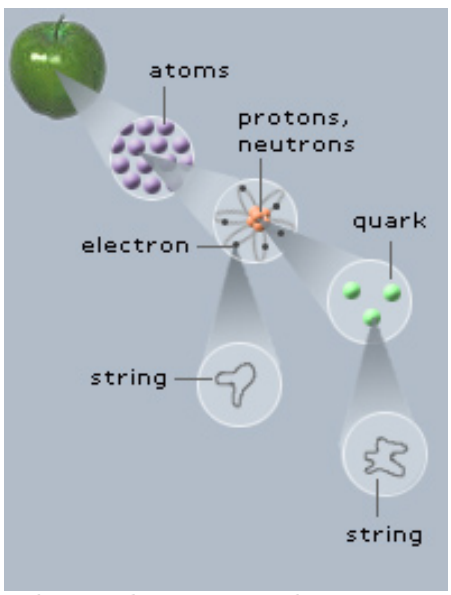

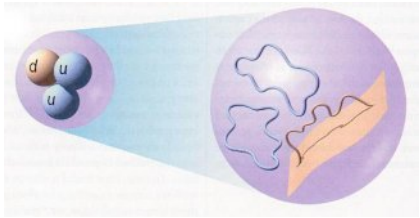

ছবি : একটি আপেলকে (কিংবা অন্য যে কোন পদার্থকে) ভেঙে টুকরো করতে অনেক দূর পর্যন্ত যদি যাওয়া যায়, তবে স্ট্রিং তাত্ত্বিকদের দাবী অনুযায়ী শেষ পর্যন্ত পাওয়া যবে কতগুলো চিকন আবদ্ধ সুতো বা স্ট্রিং।

ছবিটা বোধ হয় পাঠকদের কাছে আরেকটু স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। সোজা কথায়, ব্যাপারটা এমন নয় যে, 'ইলেকট্রন স্ট্রিং' কম্পিত হয়ে তৈরী করল ইলেকট্রনের কিংবা 'আপ-কোয়ার্ক' স্ট্রিং কম্পিত হয়ে তৈরী করল 'আপ কোয়ার্কের' - বরং একটিমাত্র স্ট্রিং বিভিন্নভাবে কম্পিত হয়ে বিভিন্ন ধরনের কণা তৈরী করছে। এডওয়ার্ড উইটেনের ভাষায়,

আপনার কাছে যদি বেহালা বা পিয়ানো থাকে, তাহলে লক্ষ্য করে থাকবেন যে, এটির তার বিভিন্ন আকৃতিতে কাঁপতে পারে। আমরা স্ট্রিং তত্ত্বে যে ধরনের তারের কথা বলছি, তাদের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হল যে, এসব তারও নানা সম্ভাব্য আকার নিতে পারে। কাজেই 'ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রিনো এবং এ জাতীয় কণিকাগুলি যে একই মৌলিক তন্তু সমূহের (basic strings) বিভিন্ন মোডের কম্পনের প্রকাশ' - এই ব্যাখ্যা থেকে প্রাথমিক কণিকাসমূহের একত্রীকরণের ধারণাটি উদ্ভুত হয়।

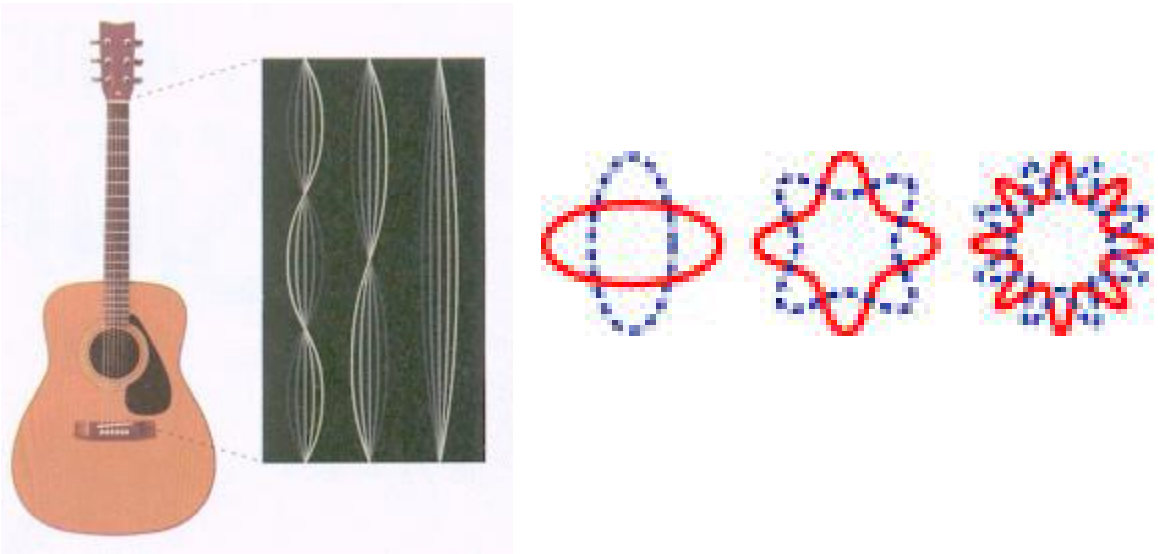

স্ট্রিং এর কম্পন : ক) গিটারের তারের ক্ষেত্রে খ) স্ট্রিং তত্ত্বের স্ট্রিং এর ক্ষেত্রে

এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটাই জন শোয়ার্জ (John Schwarz) এবং জোয়েল শ্যার্ক (Joel Scherk) মিলে ১৯৭৪ সালে গ্র্যাভিটন কণার ক্ষেত্রে সাফল্যজনকভাবে প্রয়োগ করলেন এবং মহাকর্ষ বলকে শেষ পর্যন্ত কোয়ান্টাম বলবিদ্যার অবকাঠমোর সাথে জুড়ে দিতে সমর্থ হলেন।

গ্র্যাভিটন কণার কথা অগেও বলা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, প্রকৃতিজগতের বলগুলো কোয়ান্টাম লেভেলে বিশেষ বিশেষ কণার মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়। এই কণিকাগুলোকে বলা হয় 'বার্তাবহ কণিকা' (messanger particle)। তড়িচ্চুম্বক বলের ক্ষেত্রে যেমন 'ফোটন কণিকা', তেমনি মহাকর্ষ বলের ক্ষেত্রে কল্পণা করা হয়েছে 'গ্র্যাভিটন কণিকা'। এছাড়াও সবল নিউক্লিয় বলের ক্ষেত্রে আছে 'গ্লুয়োন' (Gluon) আর দুর্বল নিউক্লিয় বলের জন্য রয়েছে W এবং Z কণা। স্ট্রিং তত্ত্ব আমাদের বলছে যে, প্রতিটি গ্র্যাভিটন আসলে প্ল্যাঙ্কের দৈর্ঘ্যের ($১০^{-৩৩}$ সেঃমিঃ) সমান দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এক কম্পণশীল তন্তু। আর যেহেতু এই গ্র্যাভিটন কণাই মহাকর্ষক্ষেত্রের ক্ষুদ্রত্তম প্রাথমিক উপাদান হিসেবে চিহ্নিত, তাই প্লাঙ্ক স্কেলের নীচে কোন কিছু

নিয়ে আসলে কথা বলার কোন অর্থই হয় না। টিভি স্ক্রিন বা কম্পিউটরের মনিটরের ক্ষেত্রে ঔজ্জ্বল্যের ক্ষুদ্রত্তম একক হচ্ছে 'পিক্সেল', ঠিক তেমনি স্ট্রিং তত্ত্ব আমাদের গ্র্যাভিটনের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রত্তম সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে - 'প্ল্যাঙ্ক স্কেল'। আর স্ট্রিং তত্ত্ব অনুযায়ী যেহেতু এই স্ট্রিংগুলোই বস্তুজগতের ক্ষুদ্রত্তম একক, কাজেই আমাদের আন্তঃ আনুবীক্ষণিক ভ্রমণ স্ট্রিং এ এসে শেষ হতে বাধ্য। যে দৈর্ঘ্যকে আমরা প্ল্যাঙ্কের দৈর্ঘ্য বলছি তা আসলে প্রকারান্তরে স্ট্রিংগুলোর নিজস্ব দৈর্ঘ্যের সমান।

স্ট্রিং তত্ত্ব কিন্তু আমাদের আরেকটি বিষয়ে বেশ ভাবাচ্ছে। এতদিন ধরে আমরা আমাদের চিরচেনা বিশ্বজগতকে জানতাম তিনটি নির্দিষ্ট মাত্রায় (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা)। সময়কে আরেকটি মাত্রা ধরলে মাত্রার সংখ্যা দাঁড়ায় চারে। এই তিন মাত্রার (সময় সহ চার) ব্যাপারটা আমাদের কাছে অনেকটা যেন 'ধ্রুব সত্য' হিসেবেই বিবেচিত হয়েছে। নিউটন থেকে ম্যাক্সওয়েল, আর ম্যাক্সওয়েল থেকে আইনস্টাইন, সবাই তাঁদের পরিচিত বিশ্বকে 'ত্রিমাত্রিক' বিশ্ব হিসেবেই দেখেছেন - এ যেন ছিল অনেকটা আগামীকাল সূর্য উঠার মতই নিশ্চিত! স্ট্রিং তত্ত্ব আমাদের এতদিনকার বদ্ধমূল ধারণায় কুঠারাঘাত করে বলছে- আমাদের বিশ্বজগৎ তিনমাত্রার নয়, প্রকৃতপক্ষে নয় মাত্রার (সময় সহ দশ)। এই দশ মাত্রার ব্যাপারটি কোন কল্পণা নয়, নয় কোন হাইপোথিসিস। স্ট্রিং তত্ত্বের সমীকরণগুলো সমাধান করেই এই সংখ্যাটি পাওয়া গিয়েছে । কাজেই স্ট্রিং তত্ত্ব দৈর্ঘ্য, প্রস্থ আর উচ্চতার বাইরেও আরও ছয়টি অতিরিক্ত মাত্রা নিয়ে আমাদের ভাবতে বাধ্য করছে। সম্প্রতি ***এম তত্ত্ব***[†] নামে আরেকটি তত্ত্ব বিজ্ঞানীরা হাজির করেছেন যেখানে মাত্রার সংখ্যা আরো একটি বেশী অর্থাৎ দশ (সময়কে ধরে ১১)। সে যাই হোক, স্ট্রিং তত্ত্ব বা এম তত্ত্ব যে কোনটা সত্যি হয়ে থাকলে আমাদের বিশ্ব যে তিনটি দৃশ্যমান মাত্রায় সীমাবদ্ধ নয়, তা নিশ্চিত হয়ে যাবে।

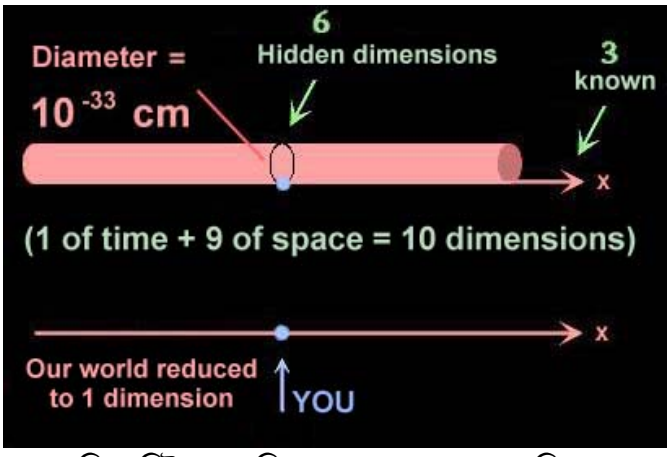

ছবি : স্ট্রিং এর ভিতর লুকানো মাত্রার চিত্ররূপ

[†] 'এম থিওরী' আসলে স্ট্রিং সংক্রান্ত প্রচলিত ৫ টি তত্ত্বকে একটি তত্ত্বের মাধ্যমে সমন্বিত করার প্রয়াস। এডয়ার্ড উইটেনের ১৯৯৫ সালে সাউদার্ণ ক্যালিফোর্ণিয়া ইউনিভার্সিটিতে এ সংক্রান্তপ্রদত্ত বক্তৃতাটিকে 'স্ট্রিং তত্ত্বের দ্বিতীয় বিপ্লব' নামে অভিহিত করা হয়। আর প্রথম বিপ্লবের সময়কাল ছিল ১৯৮৪-১৯৮৬ যখন সোয়ার্জ এবং ব্রায়ান গ্রীন মিলে স্ট্রিং তত্ত্বের বিভিন্ন গানিতিক অসঙ্গতি দূর করেন।

তাই যদি হয়, তবে অতিরিক্ত এই মাত্রাগুলোকে আমরা দেখতে পাই না কেন? ব্যাপারটা বোঝা একটু জটিল। ব্যাপারটাকে অবশ্য একটা উদাহরণের সাহায্যে সাধারণ পাঠকদের কাছে পরিস্কার করা যেতে পারে। ছোটবেলায় আমি যখন সার্কাস দেখতে যেতাম, তখন বেশ মনে আছে - দড়ির কিছু খেলা দেখে খুব অবাক হতাম। এর মধ্যে একটি খেলা ছিল এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত চিকন একটা দড়ি বেঁধে এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত হেটে যাওয়ার খেলা। সার্কাসের এক ক্লাউন বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করে নাচতে নাচতে দড়ির ওপর দিয়ে হেটে চলে যেত। প্রতিবারই ভাবতাম এই বুঝি দড়ি ছিঁড়ে ব্যাটা পড়ে বুঝি মাটিতে। দড়ি কিন্তু কখনই ছিঁড়ত না। কারণটা পরে বুঝেছিলাম। দড়িটা দূর থেকে চিকন দেখালেও আসলে কিন্তু অতটা চিকন নয়। দড়িটা আসলে অনেকগুলো দড়ি একসাথে পেঁচিয়ে খুব শক্ত করে তৈরী করা হয়েছে, যা দূর থেকে দেখা বা বোঝা সম্ভব নয়। ঠিক এ ধরনেরই একটি ব্যাপার ঘটে স্ট্রিং তত্ত্বের বেলায়। স্ট্রিং এর অতিরিক্তমাত্রাগুলো আসলে কোকড়ানো বা প্যাচানো অবস্থায় এমন একটি সূক্ষ স্তরে রয়ে গিয়েছে যে, দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবে কোনভাবেই তা বোঝা সম্ভব নয়। অনেক বিজ্ঞানীরই ধারণা, মহাবিশ্ব সৃষ্টির সময় বিগব্যাং পরবর্তী মুহূর্তগুলোতে যখন মহাজাগতিক প্রসারণ (Cosmic inflation) ঘটেছিল, তখন কেবল তিনটি দৃষ্টিগ্রাহ্য মাত্রা দেশ কালের বিস্তারে স্বাভাবিকভাবে প্রসারিত হতে পেরেছে, বাকীগুলো কোঁকরানো অবস্থায় আমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে আনুবীক্ষণিক আকারে রয়ে গেছে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, উপরের কথাগুলো যে সত্যি, তার প্রমাণ কি? আমদের মানতেই হবে যে, এর পরীক্ষালব্ধ কোন প্রমাণ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। এর কারণ হচ্ছে, আমাদের বাস্তব দৃশ্যমান যে জগৎকে আমরা চিনি তা তিন মাত্রার। বিজ্ঞানীরাও বাস করেন এই বাস্তব জগতেই। এগারো মাত্রার জগৎ টা ঠিক কিরকম তা আমাদের কল্পনায় আসে না। আমরা তো ছা-পোষা মানুষ, ১৭ বছর ধরে স্ট্রিং নিয়ে গবেষনাররত বিজ্ঞানী ব্রায়ান গ্রীন পর্যন্ত বলেন, 'আমি এই দশ-এগারো মাত্রার জগৎকে কল্পনায় চোখের সামনে ভাসাতে পারি না, আর আমি এমন কারো দেখা পাইনি যিনি পারেন' (*সূত্রঃ The Fabric of the Cosmos : Space, Time, and the Texture of Reality , Brian Greene*)। এই সমস্যার কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই মাত্রা কল্পনা করার ব্যাপারটিতে গুরুত্ব দিতে নিষেধ করা হয়, বরং বলা হয় আতিরিক্ত মাত্রাগুলোকে সমীকরণে 'অতিরিক্ত সংখ্যা' হিসেবে চিন্তা করতে। কিন্তু তারপরও কথা থেকে যায়, এই অতিরিক্ত সংখ্যাগুলোকে পরীক্ষা করে যাচাই করবার কোন উপায় আছে কি? এখন পর্যন্ত তা জানা নেই। আর মাত্রার ব্যাপারটা তো অনেক পরের কথা, স্ট্রিং তত্ত্বের ভিত্তি যে গড়ে উঠেছে স্ট্রিং কে নিয়ে তা তো কেউ চোখের সামনে দেখেননি। তাই স্ট্রিং তত্ত্বের অধিকাংশ ব্যাপার স্যাপারগুলো এখনো তত্ত্বকথার মধেই সীমাবদ্ধ। স্ট্রিং তত্ত্ব যদি কখনও সত্যি বলে প্রমাণিতও হয়, তারপরও স্ট্রিংকে কেউ দেখতে পাবে বলে মনে হয় না। স্ট্রিং এর আকার এতটাই ছোট যে, প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ এক্ষেত্রে দূরাশা মাত্র। কতাটা দুরাশা তা একটু বোঝার চেষ্টা করা যাক। স্ট্রিং কে

দেখবার আশা করা অনেকটা আমার এই পৃষ্ঠার লেখা প্রায় ১০০ আলোকবর্ষ দূর থেকে পড়তে পারার আশা করার মত। আসলে স্ট্রিং কে দেখতে হলে আজকের দিনের প্রচলিত প্রযুক্তির চেয়ে কোটি কোটি গুন শক্তিশালী বিশ্লেষনী ক্ষমতা বিশিষ্ট যন্ত্রপাতি লাগবে। প্রত্যক্ষ প্রমাণজনিত এত অসুবিধার কারণেই অনেক বিজ্ঞানী আছেন যারা স্ট্রিং তত্ত্বকে এখনো পদার্থবিজ্ঞানের আওতাভুক্ত করতে রাজী নন, বরং স্ট্রিং তত্ত্বকে রাখতে চান দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের রাজ্যে। যেমন ১৯৭৯ সালে সালাম এবং স্টিভেন ভাইনবার্গের সাথে যুগপৎ নোবেল পুরষ্কারে ভূষিত পদার্থবিজ্ঞানী সেলডন গ্লাশো (Sheldon Glashow) একটি সাক্ষাৎকারে বলেন -

> স্ট্রিং তাত্ত্বিকদের একটি সুস্থিত, মনোহর একটি জটিল তত্ত্ব আছে এবং আমি আসলেই এটি বুঝি না। মহাকর্ষের ক্ষেত্রে এটি একটি সুস্থিত কোয়ান্টাম তত্ত্বকে এটি প্রকাশ করছে, কিন্তু বাড়তি কোন ভবিষ্যদ্বানী তো করছে না। তার মানে দাড়াচ্ছে, পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে এটি যাচাই করার যেমন ব্যবস্থা নেই, তেমনি পর্যবেক্ষণ করে বলার উপায় নেই যে, 'তোমাদের তত্ত্ব ভুল'। কাজেই এই তত্ত্ব নিরাপদ, স্থায়ীভাবেই নিরাপদ। এখন আমার জিজ্ঞাসা এটি কি সত্যই ফিসিক্স, নাকি ফিলোসফি? *(সূত্রঃ Viewpoints on String Theory by Sheldon Glashow*
> *http://www.pbs.org/wgbh/nova/elegant/view-glashow.html)*

কিন্তু স্ট্রিং তাত্ত্বিকরা এই যুক্তির বিপক্ষে জোড়ালো যুক্তি হাজির করে বলছেন, প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়াও শুধু পরোক্ষ পরীক্ষণের ভিত্তিতে বহু তত্ত্বকে বিজ্ঞান গ্রহন করে নিয়েছে; বিজ্ঞানের ইতিহাস অন্ততঃ তাই বলে। আসলে পরমানুর অস্তিত্বও প্রাথমিকভাবে বিজ্ঞান গ্রহণ করেছিল পরোক্ষ প্রমাণের ভিত্তিতেই (কিছু রাসায়িনিক পদার্থের সংমিশ্রনের অনুপাত থেকে, আর পরবর্তীতে ব্রাউনীয় সঞ্চরণ থেকে); আবার প্রাথমিকভাবে ব্ল্যাক হোলের অস্তিত্বও বিজ্ঞান স্বীকার করে নিয়েছিল পরোক্ষ পর্যবেক্ষণে, 'চোখে দেখে' নয়। এরকম উদাহরণ আছে বহু। সেলডন গ্লাশোর সহপাঠী এবং সহকর্মী নোবেল বিজয়ী স্টিভেন ভাইনবার্গ ব্যাপারটি পরিস্কার করেছেন এভাবে-

> লোকে আনেক সময় বলে থাকে যে, তন্তু তত্ত্ব আর কোন বিজ্ঞান নয় - এটি হল এক ধরণের মরমীবাদ (mysticism), কারণ এর সাথে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কোন সম্পর্ক নেই। আমি মনে করি না এ অভিযোগ সঠিক। আমি মনে করি তন্তু তত্ত্ববাদীরা এমন একটা কিছু সম্পন্ন করার চেষ্টায় আছেন যা একদিন অবশ্যই স্বীকৃতি পাবে। যদি তাঁদের এই প্রচেষ্টা সকল শ্রেনীর প্রাকৃতিক বলগুলোকে একত্রিত করতে পারে, তবে একদিন তা পরীক্ষণ দ্বারাও প্রতিষ্ঠিত হবে। এর অস্তিত্ব অবশ্য এমন কোন পরীক্ষা দিয়ে যাচাই করা যবে না যা দিয়ে আমরা সয়ং তারগুলোর দেখা পেতে পারি - অর্থাৎ, এই দেখাটা স্থানের কোন অংশকে চিকন করে কাটা 'ছিন্ন ক্ষুদ্র একমাত্র ফালি' - যাকে আমরা 'তার' বলি, এরকম দেখা নয়। এই তত্ত্ব পরীক্ষার সাহায্যে যাচাই করার অর্থ হবে, পদার্থবিদ্যার যে ব্যাপারগুলো এখনও রহস্যময়, সে সব বিষয়ের ব্যাখ্যা দিতে এ তত্ত্ব সক্ষম হবে। এটি সাধারণ বিজ্ঞানেরই অংশ। তবে দুর্ভাগ্য এই যে, বিজ্ঞানের অন্যান্য অংশের তুলনায়

পর্যবেক্ষণ আওতা থেকে এর অবস্থান অনেকটা দূরে, তবে একেবারেই আশাহীন দূরত্বে নয়। *(সূত্রঃ Viewpoints on String Theory by Steven Weinberg http://www.pbs.org/wgbh/nova/elegant/view-weinberg.html)*

স্টিভেন ভাইনবার্গ স্ট্রিং তাত্ত্বিকদের প্রতি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, '*স্ট্রিং তাত্ত্বিকরা গানিতিক বিমুর্ততার রহস্য উদঘাটন করে ধীরে ধীরে পরবর্তী বড় পদক্ষেপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। আর সেটা সত্যই খুব কঠিন একটা কাজ। আমি আশা করব তারা যেন সফল হয়। আমার মনে হয় এপথে অগ্রসর হয়ে তারা সঠিক কাজটাই করছেন, কারণ এই মুহূর্তে স্ট্রিং তত্ত্বই প্রকৃতির ঐক্য রচনায় একমাত্র আশার আলো দেখাচ্ছে।*'

স্ট্রিং তত্ত্বের দুই প্রাণপুরুষ : ক) জন শোয়ার্জ খ) এডওয়ার্ড উইটেন

স্ট্রিং তত্ত্ব সত্য বলে প্রমাণিত হলে বস্তু জগৎ নিয়ে আমাদের সনাতন চিন্তা ভাবনা আমূল পালটাতে হবে। এতে অবশ্য অসুবিধার তেমন কোন কারণ নেই। অনেক ধারণাই আমরা এভাবে বিভিন্ন সময়ে পালটেছি। একটা সময় আমরা ভাবতাম যে কোন বস্তুর তাপমাত্রা বুঝি যত ইচ্ছা কমানো যায়। কিন্তু তাপগতিবিদ্যা (Thermodynamics) আমাদের শিখিয়েছে যে, বরফ গলার তাপমাত্রার ২৭৩ ডিগ্রী নীচে নামলে আমরা পরমশুন্য তাপমাত্রায় পৌঁছে যাই। এর নীচে তাপমাত্রা আর কমানো সম্ভব নয়। এই ধারণার প্রমাণ আমরা পেয়েছি পদার্থের আভ্যন্তরীণ কণাসমূহের নিজেদের মধ্যে ছুটোছুটির পরিমাপ থেকে।

সময় সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত ধারণাও আমরা পালটিয়েছি একটা সময়। নিউটন সময়কে পরম বলে ভাবতেন। আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব আমাদের সেই ধারণা বদলে দেয়।

তেমনিভাবে স্ট্রিং তত্ত্ব সত্য প্রমাণিত হলে আমাদের চিরচেনা ত্রিমাত্রিক জগতকে আমাদের মনের আয়না থেকে সরিয়ে স্থান করে দিতে হবে বহুমাত্রিক জগতের জন্য, শুধু তাই না, বস্তু

জগৎকে শেষ পর্যন্ত কতকগুলো সুতোর কম্পনে পরিমাপ করতে হবে। মেনে নিতে হবে যে, আমাদের এই সুন্দর পৃথিবী, আমদের সকলের সুখ, দুঃখ, আনন্দ, কান্না, আবেগ, ভালবাসা কিংবা আমার লেখা পড়ে পাঠকের হতাশা গুলো আসলে কিছুই নয় - মগজের ভিতরকার রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফল; আর এই রাসায়িনিক বিক্রিয়া ঘটছে আসলে মগজের আভ্যন্তরীন অনু-পরমানু গুলোর মধ্যে যা আরেকটু ক্ষুদ্র স্কেলে গেলে ওই ইলেকট্রন আর কোয়ার্কে, শেষ পর্যন্ত যা কিনা স্রেফ কতগুলো সুতোর কাঁপুনি ছাড়া আর কিছু নয়!

ধন্যবাদ.

৭ম পর্ব...

আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী -৭

(মহাবিশ্ব এবং ঈশ্বর -একটি দার্শনিক আলোচনা)

অভিজিৎ রায়
www.mukto-mona.com

'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' লেখা শুরু করেছিলাম হঠাৎ করেই। একটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। মহাবিশ্বের অস্তিত্বের পেছনে আধুনিক বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্যগুলো সহজ সরল ভাষায় বাঙ্গালী পাঠকদের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া। আমি ভাবিনি যে সিরিজটি পাঠকদের এত আদৃত হবে। ৫/১২/২০০৩ তারিখে শেষ পর্বটি মুক্ত-মনায় প্রকাশ হওয়ার পর অনেক পাঠক আমাকে ব্যক্তিগতভাবে ই-মেইল করে সিরিজটি বই আকারে প্রকাশ করে ফেলতে উপদেশ দিয়েছেন। পাঠকদের আগ্রহকে স্থায়িত্ব দিতে মুক্ত-মনার পক্ষ থেকে পুরো সিরিজটিকে বই আকারে প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সে জন্য সমস্ত অধ্যায় গুলোকেই নতুন করে ঢেলে সাজানো হয়েছে। মুক্ত-মনায় যে ভার্সনটি পাওয়া যাচ্ছে তার বইরেও অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য বইয়ে থাকবে, থাকবে জটিল অংশগুলোর ব্যাখ্যা, বিজ্ঞানীদের মজার মজার ঘটনা, প্রয়োজনীয় টিকা-টিপ্পনি, মুক্ত-মনার ছোটট ইতিহাস, আর একজন বিখ্যাত তাত্ত্বিক পদার্থবিদের মুখবন্ধ। সব কিছু হয়ত ইনটারনেটে ভার্সনটিতে পাওয়া যাবে না, একটা কারণ অবশ্যই কপিরাইটের ঝামেলা এড়াতে, আর কিছুটা এখন থেকেই পাঠকদের বইটির প্রতি কৌতুহলী করে তুলবার তাগিদে! সব কিছু যদি ঠিকঠাক মত চলে, তবে এবারের একুশের বই মেলায় হত বইটিকে দেখা যেতে পারে।

শেষ অধ্যায়টি একটু বর্ধিত আকারে পুনঃ প্রকাশিত হল। পাঠকদের সুচিন্তিত মন্তব্য আশা করছি।

অভিজিৎ
ইমেইলঃ charbak_bd@yahoo.com
১৮/০৯/২০০৪

পূর্ববর্তী পর্বের পর হতে...

বছর তিনেক আগের কথা। একবার একটি বাংলাদেশী ই-ফোরামে এক ভদ্রলোকের সাথে দর্শনগত কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। আমি তখন সবেমাত্র ই-ফোরামগুলোতে লেখালিখি শুরু করেছি। ভদ্রলোক আমাকে তার জীবনের একটি ঘটনা গল্পচ্ছলে উল্লেখ করে বললেন,

গতকাল আমি আমার এক বন্ধুর বাসায় যাচ্ছিলাম, পার্টিতে। কিন্তু বেরুতে গিয়ে অযথাই আমার দেরী হয়ে গেল। কারণ বাড়ীর বাইরে পা দিয়েই দেখি প্রচন্ড বৃষ্টি। আমার বাড়ীর চারপাশটা বৃষ্টির পানি জমে এমনভাবে ভরাট হয়ে ছিল যে, বন্ধুর বাসায় যাওয়াটাই শেষ পর্যন্ত মুশকিল হয়ে দাঁড়ালো।

এমনি সময় আমার বাড়ীর পাশের একটা গাছ হঠাৎ করেই ভেঙে পড়ল আর তারপর জমে থাকা পানির উপর ভাসতে লাগল। ভাসতে ভাসতেই গাছের ডাল-পালা বিল্ডিং এর এখানে ওখানে বাড়ি খেয়ে ভেঙে পড়ে যেতে লাগল আর শেষ পর্যন্ত যা ঘটল তা এককথায় অবিশ্বাস্য - চোখের সামনে দেখলাম বিশাল গাছটি একটা নৌকায় পরিণত হয়ে গেল। এই নৌকায় চেপেই আমি অবশেষে আমার বন্ধুর বাসায় পৌঁছুতে পারলাম। অবাক ব্যাপার, তাই না? নৌকাটি ছিল একদম নিঁখুত, গ্রাম বাংলার মাঝিরা যে নৌকাগুলোয় দাড় বায় - একদম সেই রকম। এমন একটা নৌকা নিজে থেকেই তৈরী হয়ে গিয়েছিল কোন মানুষের প্রচেষ্টা ছাড়াই- আমার চোখের সামনে!

'যত সব ননসেন্স' - আপনি হয়ত ধৈর্য হারিয়ে বলে উঠবেন -

'কিভাবে একটা নৌকা কোন মানুষের প্রচেষ্টা ছাড়াই নিজে থেকে তৈরী হয়ে যেতে পারে?'

'আপনার এভাবে নিজে নিজে নৌকা তৈরী হয়ে যাওয়ার কাহিনী শুনে মনে হচ্ছে কেউ একজন যেন দোয়াতের বোতল থেকে কালি নিয়ে ইচ্ছে মত দিস্তে দিস্তে কাগজে ছিটিয়ে দিল আর তা সুন্দর একটা অভিধানে পরিণত হয়ে গেল!'

'কিভাবে নৌকার মত একটা জিনিস কোন পরিকল্পণা ছাড়া, কারো প্রচেষ্টা ছাড়া এমনি এমনি তৈরী হয়ে যেতে পারে?'

তাহলে অভিজিৎ সাহেব, আমায় বলুন তো- যেখানে একটা সাধারণ নৌকাই কারো ইচ্ছে ছাড়া নিজে থেকে তৈরী হয়ে পানিতে ভেসে থাকতে পারে না, সেখানে কিভাবে আমাদের দেহের মত জটিল সিস্টেম হুট করে কোন কারণ ছাড়াই তৈরী হয়ে যেতে পারে?

কিংবা ,

কিভাবে এই জটিল মহাবিশ্ব কারো উদ্দেশ্য বা পরিকল্পণা ছাড়া এমনি এমনি তৈরী হয়ে যেতে পারে?'

খুবই যৌক্তিক প্রশ্ন। যেখানে একটি নৌকা নিজে থেকে তৈরী হয়ে পানিতে ভেসে থাকতে পারে না, সেখানে কিভাবে এই জটিল মহাবিশ্বকে 'সয়ম্ভু' বলে আমরা ভেবে নিতে পারি? কিভাবে ধারণা করতে পারি এই যে সুশৃঙ্খল বিশ্ব, প্রাণী-জগৎ, প্রকৃতি, গ্রহ-তারা এত সব কিছু নিজ থেকে সৃষ্ট হয়ে এমনি অবস্থায় এসে পৌঁছেছে কোন পরম পুরুষের হাতের ছোঁয়া

ছাড়া? সৃষ্টিকর্তার ভূমিকা ছাড়া সৃষ্ট হয়েছে এ নয়নাভিরাম বিশ্ব? বললেই হল নাকি! মানব-মন সত্যই সায় দিতে চায় না এ ধরনের তথাকথিত 'অবাস্তব' অনুকল্পে। তাই আমাদের এই বিশ্বজগতের পেছনে সত্যিকারের 'পরম-পিতা'জাতীয় কেউ আছেন - এই স্বজ্ঞাত ধারণা তাড়িত করেছে, ভাবিত করেছে যুগে যুগে দার্শনিকদের। ৩৯০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে সক্রেটিস তার একটি লেখায় বলেছিলেন -'With such signs of forethought in the design of living creatures, can you doubt they are work of choice or design?' প্লেটোও ভেবেছেন যে, এই মহাবিশ্ব দেখে বোঝা যায় যে, এর পেছনে একজন নক্সাকার (Designer) রয়েছেন। তবে সবচাইতে সুন্দরভাবে এই ধারণাটি ব্যক্ত করেছেন উইলিয়াম পিলে নামে এক ধর্মজাজক ১৮০২ সালে তার 'ন্যাচারাল থিওলজি' নামের একটি বইয়ে :

> *'ধরা যাক জঙ্গলে চলতে চলতে এক ভদ্রলোক হঠাৎ একটি ঘড়ি কুড়িয়ে পেলেন। উনি কি ভেবে নেবেন যে ঘড়িটি নিজে থেকেই তৈরী হয়ে জঙ্গলে পড়ে ছিল, নাকি কেউ একজন ঘড়িটি তৈরী করেছিল?'*

পিলের এই আরগুমেন্টটি দর্শন শাস্ত্রে পরিচিত হয়েছে - 'Argument from Design' নামে। মহাবিশ্বের উৎপত্তির পেছনে ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে এটি একটি অত্যন্ত জোড়ালো যুক্তি হিসেবে বিগত সময়গুলোতে ব্যবহৃত হয়েছে। একটি ঘড়ি যেমন নিজে থেকে সৃষ্ট হয়ে জঙ্গলে পড়ে থাকতে পারে না, ঠিক তেমনি এই মহাবিশ্বও নিজ থেকে সৃষ্ট হয়ে এমনি অবস্থায় চলে আসতে পারে না। ঘড়ি তৈরীর পেছনে যেমন ঘড়ির কারিগরের ভূমিকা আছে, তেমনি মহাবিশ্ব 'তৈরীর' পেছনেও ঈশ্বর জাতীয় কোন 'কারিগরের' হাত থাকতেই হবে; এই ধারণাটি একটা সময়ে আস্তিকদের মধ্যে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক যুক্তি হিসেবে বিবেচিত হত। এখনও বেশ কিছু বাংলাদেশী ফোরামেই এই যুক্তিটি ঈশ্বরের বিশ্বাসের সপক্ষে অত্যন্ত জোড়ালোভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন মুক্ত-মনার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে চিহ্নিত দুটি 'বিশ্বাস নির্ভর' ওয়েব-সাইটে 'God's Existence' নামে একটি প্রবন্ধ রাখা আছে যার মূল সুরটিই হচ্ছে উইলিয়াম পিলের ঘড়ির কারিগর তত্ত্বের (Watchmaker argument) মাধ্যমে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমানের চেষ্টা। তবে যারা 'নিরপেক্ষ' দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জ্ঞান বিজ্ঞান আর যুক্তিবাদের চর্চা করে যাচ্ছেন, তাদের কাছে কিন্তু পিলের যুক্তির দুর্বলতা গুলো অনেক আগেই ধরা পড়েছে। Oxford Universityর অধ্যাপক রিচার্ড ডকিনস তার বিখ্যাত 'The Blind Watchmaker' বইয়ে এর অন্তর্নিহিত ত্রুটিগুলো নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। পাঠকদের উদ্দেশ্যে এর কিছু তুলে ধরা হলঃ

১) <u>ঘড়ির কারিগরের পিতা :</u>

ঘড়ির যেমন ঘড়ির কারিগর থাকে, তেমনি প্রত্যেক কারিগরেরই থাকে পিতা। তাহলে মহাবিশ্বের কারিগর রূপী ঈশ্বরের পিতাটি কে? এই প্রশ্ন মনে আসাও স্বাভাবিক। আর সেই

পিতার পিতাই বা কে ছিলেন, আর তার পিতা? - এমনি ভাবে প্রশ্নের ধারা চলতেই থাকবে। এই প্রশ্ন আমাদের ঠেলে দেবে অন্তহীন অসীমত্বের দিকে। বিশ্বাসীরা সাধারণতঃ এই ধরনের প্রশ্নের হাত থেকে রেহাই পেতে সোচ্চারে ঘোষনা করেন যে, ঈশ্বর সয়ম্ভু। তার কোন পিতা নেই, তার উদ্ভবের কোন কারণও নেই। তিনি অনাদি- অসীম। এখন এটি শুনলে অবিশ্বাসীরা/যুক্তিবাদীরা স্বভাবতই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিতে চাইবেন, 'ঈশ্বর যে সয়ম্ভু তা আপনি জানলেন কি করে? কে আপনাকে জানালো? কেউ জানিয়ে থাকলে তার জানাটিই যে সঠিক তারই বা প্রমাণ কি? আর যে যুক্তিতে ঈশ্বর সয়ম্ভু বলে ভাবছেন, সেই একই যুক্তিতে বিশ্বব্রমান্ডেরও সৃষ্টি স্রষ্টা ছাড়া এটি ভাবতে অসুবিধা কোথায়?' দর্শনশাস্ত্রে 'অক্কামের রেজর' নামে একটি সূত্র প্রচলিত আছে, যার নিরিখে বিশ্বাসীদের ঈশ্বরে বিশ্বাসটিকে সহজেই সমালোচনা করা যেতে পারে।

২) ঘড়ি বানায় ঘড়ির কারিগর, আর নৌকা বানায় নৌকার কারিগর ঃ

আমি প্রবন্ধের শুরুতে বর্ণিত ঘটনাতে ফিরে যাই। বন্ধুর বাড়ীতে যাওয়ার পথে হঠাৎ করে একটি নৌকা দেখে উক্ত ভদ্রলোকের নৌকাটির পিছনে কারিগর থাকার কথা মনে হয়েছে। কিন্তু একটি নৌকা দেখে কি কারো মনে হতে পারে যে, একজন ঘড়ির কারিগর নৌকাটি বানিয়েছে? কখনই না। আমদের স্বভাবতই মনে আসে নৌকার কারিগরের কথা। তেমনি ভাবে আমাদের সমাজে আমরা দেখি- জুতা বানায় জুতার কারিগর, ঘড়ি বানায় ঘড়ির কারিগর, সোনার কাজ করে সোনার কারিগর (স্বর্ণকার)। একই কারিগর তো সবকিছু বানাচ্ছে না। একই যুক্তিতে তাহলে আমাদের সৃষ্ট জীবনের জন্য দরকার একজন জীবনীকার, সূর্যের জন্য চাই সূর্যকার (সূর্যের কারিগর), চন্দ্রের জন্য একজন চন্দ্রাকার, আর বৃষ্টির জন্য চাই একজন বৃষ্টিকার, ইত্যাদি। কিন্তু ঘড়ির জন্য ঘড়ির কারিগরের উপমা নিয়ে শুরু করলেও বিশ্বাসীরা মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে প্রতিটি বস্তুর জন্য যুক্তিহীন ভাবে একজনমাত্র সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কল্পণা করে থাকেন।

৩) শুন্য হতে ঘড়িঃ সাইবাবার ম্যাজিক?

ঘড়ি বা নৌকা বানানোর জন্য যে সমস্ত উপাদানের প্রয়োজন তা কিন্তু প্রকৃতিতে বিদ্যমান। নৌকার ক্ষেত্রে কাঠ পাওয়া যায় গাছ কেটে। ঘড়ির ভিতরের কল কব্জাগুলো বানানো হয় লোহা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি ধাতুথেকে। কিন্তু বলা হয়, সর্ব শক্তিমান ঈশ্বর এই মহাবিশ্বতৈরী করেছেন স্রেফ শুন্য হতে (ex Nihilo) । সুতরাং ঘড়ির কারিগরের সাথে মহাবিশ্বের কারিগরের মিল খোঁজার চেষ্টাটি ভুল।

৪)ভুল সাদৃশ্য :

ঘড়ির কারিগরের সাদৃশ্যটি আরেকটি কারণে ভুল তা হল, এখানে অবচেতন মনে ভেবে নেওয়া হচ্ছে যে, যেহেতু দুটি বস্তু একটি কমন বৈশিষ্ট্য বিনিময় করছে, অতএব, তাদের তৃতীয় একটি কমন বৈশিষ্ট বিদ্যমান থাকবে।
যেমন ধরা যাক নীচের উদাহরনটিঃ

a. ঘড়ির গঠন জটিল
b. ঘড়ির জন্য একজন কারিগর দরকার।
c. মহাবিশ্বের গঠনও জটিল
d. সুতরাং মহাবিশ্বের জন্য একজন কারিগর আবশ্যক।

শেষ পদক্ষেপটি ভুল। কারণ, এটি এমন একটি উপসংহারের দিকে আমাদের নিয়ে গেছে যা বিচারের নীতি বা নির্নায়ক দ্বারা সমর্থিত নয়। উপরের যুক্তির ভুলটি নীচের আরেকটি উদাহরনের সাহায্যে আরো ভালভাবে পরিস্কার করা যায়ঃ

a. পাতার গঠন জটিল
b. পাতা গাছে জন্মায়।
c. টাকার হিসাব (Money bills) এর গঠনও জটিল
d.সুতরাং টাকা গাছে জন্মায় (এটি প্রবাদে হতে পারে, কিন্তু বাস্তবে নয়!)।

৫) অসঙ্গতি :
পিলের আরগুমেন্টে ধরে নেওয়া হয়েছে ঘড়ির গঠন প্রকৃতিতে প্রাপ্ত পাথর, খনিজ বা পাহাড়-পর্বতের মত সহজ সরল ও বিশৃংখল নয়। তাই তার কারিগর লাগবে। আবার একই সাথে মহাবিশ্বের গঠন ধরে নেওয়া হয়েছে জটিল এবং সুশৃংখল ('সহজ সরল' প্রকৃতি এর একটি অংশ হওয়া সত্ত্বেও)। তাই এটি একটি অসম তুলনা।

৬) চক্রাকার যুক্তি :
'কে বানালো এমন নিখুঁত মহাবিশ্ব?' অথবা, 'বলুন তো, আমাদের তৈরী করেছে কে?' (Who created you?) -প্রায়শঃই এ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় যূক্তিবাদীদের। কিন্তু যারা এ ধরনের প্রশ্ন করেন তারা বোঝেন না যে, এধরনের প্রশ্ন বিজ্ঞানের চোখে অর্থহীন প্রশ্ন। সঠিক প্রশ্নটি হবে 'এই সৃষ্টি রহস্যের প্রক্রিয়াটি কি?' বা 'আমাদের জীবন গঠনের মূল প্রিন্সিপালটি কি?' এবং বিজ্ঞান সর্বদাই এধরনের প্রশ্নের উত্তর খুজতে সচেষ্ট এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দিতে সক্ষম। বিজ্ঞান আজ পরিস্কারভাবেই জানে যে মহাবিশ্বের নিয়ন্ত্রক কোন 'ঈশ্বর' নামক কোন 'বড় বাবু' নন, বরং পদার্থবিজ্ঞানের কিছু সহজ সুত্রাবলী (Laws of Physics)। আসলে এ মহাবিশ্বে যা কিছু ঘটছে তা পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম মেনেই ঘটছে।

প্রাকৃতিক, অতিপ্রাকৃতিক কারো পক্ষেই পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মকে ডিঙ্গিয়ে কোন কিছু করা সম্ভব নয়। কাজেই, আমাদের এ পর্যন্ত পাওয়া জ্ঞান থেকে বলা যায় 'ঈশ্বর' বলে কাউকে আভিহিত করতে চাইলে তা করা উচিত আসলে পদার্থবিজ্ঞানের প্রাণহীন সূত্রগুলিকে।

বিশ্বাসীদের তরফ থেকে করা 'কে আমাদের বানিয়েছে' এ ধরনের প্রশ্ন আরেকটি কারণে অর্থহীন তা হল, এখানে প্রচ্ছন্ন ভাবে উত্তরটি আগে থেকেই গ্রহন করে নেয়া হয়েছে -'কে আবার বানাবে - ঈশ্বর!'। এটি নিঃসন্দেহে একটি loaded Question। অর্থাৎ ঈশ্বর আছে এটা ধরে নিয়েই এধরনের প্রশ্নকরে উত্তর খোঁজার চেষ্টা এক ধরনের চক্রাকার প্রচেষ্টা। মুক্তমনা সদস্য অপার্থিব জামান তার Who Created you? পবন্ধে ব্যাপারটি খুব পরিস্কার ভাবেই ব্যাখ্যা করেছেনঃ

> **The question "WHO" created you <u>does not make any sense</u> because one the question <u>already assumes</u> an answer, that there IS a creator**, and if there IS a creator then the answer to the question cannot be but a tautology: The creator created you. Surely the questioner did not ask the question to know the name of the creator. So it is a meaningless question. As I said the right question is WHAT (not WHO) is the CAUSE of the creation of life, IF there is any. And the answer is the one above I gave (And unanimously agreed upon by majority of leading Physicists and Biologists).

প্রাচীনকালে জ্ঞান-বিজ্ঞান যখন সীমাবদ্ধ ছিল, তখন প্রাকৃতিক বিভিন্ন 'দৈব' ঘটনার কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না পেয়ে নানা ধরনের 'অতিপ্রাকৃতিক সত্ত্বার' কল্পনা করে নিয়েছে মানুষ। বনে হঠাৎ দাবানলে সমস্ত কিছু যখন পুড়ে ছাই হয়ে যেত, তখন ভয়ে পেয়ে মানুষ এর পেছনে 'অগ্নি দেবীর' কল্পনা করে নিয়েছে। পুজো-অর্চ্চনা করে সেই দেবীকে তুষ্ট করতে চেয়েছে বারেবারেই ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার আশায়। বৃষ্টি কেন হয় এ ব্যাপারটিও এক সময় মানুষের জানা ছিল না। তাই ঝড়-বৃষ্টি নিয়ন্ত্রনের জন্য মুসলিমরা যেমনি 'মিকাইল ফেরেস্তার' কল্পনা করেছে হিন্দুরা করেছে 'দেবরাজ ইন্দ্রের' কল্পনা। কিন্তু আজ স্কুলের ছোট ছেলেটিও জানে মিকাইল ফেরেস্তা বা ইন্দ্রের হাতের কারসাজিতে নয়, বৃষ্টি হয় পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম মেনে জলচক্র (Water cycle) অনুসরন করে। কিভাবে জল বাষ্প হয়ে উপরে উঠে যায়, কিভাবে তা মেঘে পরিনত হয়, আর কিভাবে তা আবার বারিধারায় রূপান্তরিত হয়ে ফিরে আসে তা আজ প্রাইমারী স্কুলের বইগুলোতেই পাওয়া যায়। এই পৃথিবীটা কিভাবে শূন্যে ঝুলে থাকে তা একসময় মানুষের জানা ছিল না, রহস্য সমাধান করতে গিয়ে মানুষ এই পৃথিবীটকে বসিয়ে দিয়েছে কখনও এটলাসের কাঁধে, কখনও অদৃশ্য গরুর শিং এর উপর আথবা কোন দৈত্যাকার কোন কচ্ছপের পিঠে। কিন্তু

আজকের স্কুলে পড়ুয়া ছাত্ররাও এটলাস-গরু-কচ্ছপ ছাড়াই স্রেফ নিউটনের মহাকর্ষ সুত্র খুব ভালভাবেই শুন্যপথে গ্রহ-নক্ষত্রাদির বিচলন ব্যাখ্যা করতে পারে। মৃত্যুর ব্যাপারটি বুঝতে না পেরে মানুষ একসময় কল্পনা করেছে 'অদৃশ্য আত্মার'। কল্পনা করেছে যমদূত বা আজরাইলের মত কাল্পনিক চরিত্রের। কিন্তু বিজ্ঞান আজ আজরাইলের প্রাণহরনের গালগপ্প বা আত্মার অমরত্ব ছাড়াই প্রকৃতি জগতের নিয়ম-কানুন দিয়ে মৃত্যুকে ব্যাখ্যা করতে পারছে। এ বিষয়ে আমার লেখা 'প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে' নামের একটি প্রবন্ধ মুক্ত-মনা ওয়েব-সাইটে রাখা আছে, উৎসাহী পাঠেরা সেটি পড়ে দেখতে পারেন।

এটা ঠিক যে মহাবিশ্ব সৃষ্টির আদি নিয়ামকগুলোর অনেক কিছুই এখনও অজানা, অনেক কিছুই এই মুহূর্তে ব্যাখ্যাতীত, কিন্তু তা বলে এ নয় যে তার পেছনে ঈশ্বর নামক কোন কাল্পনিক সত্ত্বাকে আমাদের মেনে নিতে হবে। আজকের বিজ্ঞানীদের কাছে যা অজানা ভবিষ্যতের বিজ্ঞানীরা তার সমাধান নিয়ে আসবেন, এবং তা তারা সমাধান করবেন বিজ্ঞানকে ব্যবহার করেই। এভাবেই প্রতিনিয়ত আমাদের জ্ঞান এগুচ্ছে। অনেকেই এ ব্যাপারটি বুজতে চান না। যখনই কোন রহস্য সমাধান করতে তারা ব্যর্থ হন, এর পেছনে ঈশ্বরের ভুমিকাকে কল্পনা করে নেন। যখনই আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যে কোন ফাঁক ফোকর দেখতে পান, এর ভিতরে ঈশ্বরকে গুজে দিয়ে এর একটা সহজ সমাধান দিতে সচেষ্ট হন। এধরনের আর্গুমেন্টকে দর্শনের পরিভাষায় বলে 'God in gaps'। একটা উদাহরণ দেই। সৃষ্টির আদিতে অ্যামিনো এসিডের মত জটিল অনু কিভাবে তৈরী হল তার পুরো প্রক্রিয়াটি এখনো আমাদের অজানা। বিশ্বাসীরা স্বভাবতই এর পেছনে ঈশ্বরের হাত থাকার ব্যাপারটি নির্দ্বিধায় মেনে নেন। এটা অনেকটা প্রাচীনকালে বৃষ্টি কিভাবে হয় তা বুঝতে না পেরে এর পেছনে 'মিকাইল ফেরেস্তা'কে কল্পনা করে গোঁজামিল দেওয়ার মত ব্যাপার। আমরা জানি, যতই বিজ্ঞান এগুচ্ছে এই ধরনের ফাঁক ফোকর থেকে ঈশ্বরকে সরিয়ে বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে তা ভরাট করবার চেষ্টা করছে। কারণ মানুষ জানে ঈশ্বর বা অন্য কাল্পনিক সত্ত্বাকে হাজির করে কোন কিছু ব্যাখ্যা করা আসলে অজ্ঞানতার সামিল। রাহুল সঙ্কৃত্যায়ন তার 'নতুন মানব সমাজ' গ্রন্থে ঈশ্বর প্রসঙ্গে বলেছেন - '*অজ্ঞতার অপর নামই হল ঈশ্বর। মানুষ তার অজ্ঞতাকে সোজাসুজি স্বীকার করতে ভয় পায় তাই ঈশ্বর নামক একটি সম্ভ্রান্ত নাম খুঁজে বের করেছে।*' খুবই সত্যি কথা। 'ঈশ্বর কোন কিছু বানিয়েছেন' দাবী করা আসলে ঘুরিয়ে পেচিয়ে স্বীকার করে নেওয়া যে - 'আমি জানি না'। পাঠকদের অনেককেই হয়ত স্কুল জীবনে পদার্থবিজ্ঞানের পরীক্ষায় 'আকাশ নীল কেন' বা 'রং ধনু কিভাবে তৈরী হয়' - এধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। পরীক্ষার্থীরা স্বভাবতই এ ধহরনের প্রশ্নের উত্তরে অন্তর্নিহিত বৈজ্ঞানিক কারণগুলোই ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু কোন পরীক্ষার্থী যদি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে '*আকাশ নীল কারণ আল্লাহ আকাশকে নীল করে তৈরী করেছেন*' - এ ধরনের উত্তর পরীক্ষার খাতায় লিখে আসে, তবে সে কত নম্বর আশা করতে পারে? স্রেফ শূন্য। পরীক্ষক ধরেই নেবেন যে 'আকাশ নীল কেন' এই প্রশ্নের উত্তর সেই পরীক্ষার্থী

জানে না, তাই আবোল-তাবোল লিখছে। তাই নয় কি? কাজেই মহাবিশ্ব কিভাবে সৃষ্টি হল তার উত্তরে কেউ ঝদি বলেন 'ঈশ্বর বানিয়েছেন' তবে তা হবে আসলে ওই পরীক্ষার্থীর উত্তরের মতই হাস্যকর এবং অজ্ঞতাসূচক। তাই দর্শনের পরিভাষায় এই ধরনের কুযুক্তিকে বলে 'Argument from ignorance'।

এবার দর্শন থেকে একটু বিজ্ঞানের জগতে পা রাখা যাক। আমি এর আগের একটি পর্বে বলেছিলাম যে আমাদের এই পরিচিত মহাবিশ্ব প্রায় ১৫০০ কোটি বছর আগে এক মহা-বিস্ফোরনের মাধ্যমে অসীম ঘনত্বের এক উত্তপ্ত পুঞ্জিভূত অবস্থা (যাকে পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় অদ্বৈত বিন্দু (Singularity point)) থেকে সৃষ্ট। দেশ কালের ধারণাও এসেছে এই বিগ-ব্যাঙের পর মুহুর্ত থেকেই; কাজেই তার আগে কি ছিল - এই প্রশ্ন বিজ্ঞানের ভাষায় একেবারেই অর্থহীন। আসলে অর্থহীন এ কারণে যে, আমাদের পরিচিত পদার্থবিজ্ঞানের সুত্রগুলো দিয়ে ওই অবস্থাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। আমরা এর আগে দেখেছি নিউটনের সূত্রকে আলোর বেগের কাছাকাছি অবস্থায় এসে ভেঙে পড়তে। তেমনি আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতত্ত্বসহ অন্যান্য যে সূত্রগুলো মহাবিশ্বের রহস্য উদঘাটনে আজ ব্যবহৃত হচ্ছে - সিংগুলারিটি বিন্দুতে গিয়ে সেগুলোও কিন্তু কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং এ ব্যাপারটিকে খুব ভালভাবে ব্যাখ্যা করেছেন -

> A singularity is a place where the **classical concepts of space and time break down** as do all the known laws of physics because they are all formulated on a classical space-time background. ... [T]his breakdown is not merely a result of our ignorance of the correct theory but represents a fundamental limitation to our ability to predict the future [of the singularity], a limitation that is analogous but additional to the limitation imposed by the normal quantum-mechanical uncertainty principle (*সুত্রঃ Stephen Hawking, 'Breakdown of Predictability in Gravitational Collapse' Physical Review D 14 (1976): 2460. Since 1982*).

তার মানে দাঁড়াচ্ছে যে, ঈশ্বর যদি মহাবিশ্ব সৃষ্টি করে থাকেন তা করেছেন এক উদ্দেশ্যবিহীন এবং নিয়ম বিহীন অবস্থা (অদ্বৈত বিন্দু) থেকে। বিশ্বাসীরা সর্বদাই এই মহাবিশ্ব এবং মানবজাতির সৃষ্টির পেছনে এক মহাবুদ্ধিমান এক অজ্ঞাত সত্ত্বার 'সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য' এবং 'অভাবিত দিক নির্দেশনার' সন্ধান লাভ করেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সর্বজ্ঞ ঈশ্বর যদি কোন নির্দিষ্ট কারণে মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেনই তবে তিনি তা উদ্দেশ্যবিহীন (purposeless) নিয়মবিহীন (lawless) এবং অগোছালো (chaotic) অবস্থার মধ্যে দিয়ে নিজের সৃষ্টিকে নিয়ে যাবেন কেন? তার সৃষ্টির প্রক্রিয়া তো হওয়া উচিৎ অনেক বাঙ্ময়,

ব্যাপ্ত, উদ্দেশ্যমূলক এবং নিশ্চয়তাপ্রদানকারী। কিন্তু বাস্তবতাটি ঠিক উলটা। দার্শনিক Quentin Smith তাই তার Simplicity and Why the Universe Exists প্রবন্ধে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন (সুত্রঃ Philosophy *71 (1997): 125-32*)ঃ

> 'It has been countered that God could intervene in his creation at the big bang singularity and ensure that it explodes in a big bang that has the laws and physical conditions that lead to the evolution of intelligent life. But this response is implausible, **since this would be an irrational way to create a universe with intelligent beings**; there is no reason to create a singularity that requires immediate corrective intervention to ensure the desired result.'

নোবেল বিজয়ী পদার্থবিদ স্টিফেন ওয়েইনবার্গের কথায়ও লক্ষ্য করা যায় একই সুর (*সূত্রঃ অপার্থিব জামান, ঈশ্বরের অস্তিত্ব- সৃষ্টির যুক্তি খন্ডন*, মুক্ত-মনা)ঃ

> 'যে বিশ্ব একেবারে বিশৃঙ্খল, বিধিবিহীন, তেমন একটি বিশ্বকে কোন মুর্খের সৃষ্ট বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।'

আরেকটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিশ্বাসীদের অনেকেই ভেবে নেন যে সৃষ্টির আদিতে শুন্য থেকে মহাবিশ্বের উৎপত্তি স্রেফ অলৌকিক একটি ব্যাপার - এবং এই ব্যাপারটি কেবল 'ঈশ্বর' নামক একটি সত্ত্বার 'ভেল্কি-বাজি' দিয়েই কেবল ব্যাখ্যা করা যায়। এমনভাবে ভাবার কারণও আছে। আমরা ছোটবেলায় পদার্থবিজ্ঞানের বইয়ে পড়েছি শুন্য থেকে কোন কিছু সৃষ্টি হতে পারে না। তাহলে - এই যে আমরা আজ চোখের সামনে পরিচিত পদার্থ আর শক্তির জগৎ দেখছি তার উদ্ভব কোথা থেকে ঘটল? কিভাবে শূন্য থেকে পদার্থের সৃষ্টি হল? কিভাবে তৈরী হল আমাদের এ বিশ্বজগৎ? আসলে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আমাদের স্কুলের পদার্থবিজ্ঞানের পাঠ চুকিয়ে কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার পাঠ নিতে হবে। ব্যাপারটি সাধারণ পাঠকের জন্য বোঝা একটু জটিল। সহজ বাংলায় বললে বলতে হয়, 'শুন্য থেকে কোন পদার্থ তৈরী হয় না' - এ ধারণাটি চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞানের জগতে হয়ত সত্য, তবে কোয়ান্টাম পদার্থের জগতে সত্য নয়। কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা খুব ভালভাবেই দেখিয়েছে যে, অনিশ্চয়তা তত্ত্ব অনুসরন করে শুন্য থেকে পদার্থ ও শক্তি তৈরী হতে পারে। এই প্রক্রিয়াটাকে বলে 'ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশন' (vacuum fluctuation)।

অস্ট্রেলিয়ান সেন্টার অব অ্যাস্ট্রোবায়লজির অধ্যাপক পল ডেভিসের মতে,

> In the everyday world, energy is always unalterably fixed; the law of energy conservation is a cornerstone of

> classical physics. But in the quantum microworld, energy can appear and disappear out of nowhere in a spontaneous and unpredictable fashion. (*Paul Davies, God and the New Physics. London: J.M. Dent & Sons. 1983, p 162*)

অনেক বিজ্ঞানীই মনে করেন যে, ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশনের মাধ্যমে শুন্য থেকে স্বতস্ফুর্তভাবে বিশ্বজগৎ তৈরী হওয়া কোন অসম্ভব বা অলৌকিক ব্যাপার নয়। এবং এভাবে বিশ্বজগৎ তৈরী হলে তা পদার্থবিজ্ঞানের কোন সূত্রকেই আসলে অস্বীকার করা হয় না। কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসরণ করে শূন্য অবস্থা থেকে যে বিশ্বজগৎ তৈরী হতে পারে- এ ধারণাটি প্রথম ব্যক্ত করেছিলেন নিউইয়র্ক সিটি ইউনিভার্সিটির এডয়ার্ড ট্রায়ন, ১৯৭৩ সালে। তবে তারও আগে 'বিগ-ব্যাঙের জনক' গ্যামোর মাথাতেও ধারণাটি এসেছিল। গ্যামো তার 'My World line' গ্রন্থে ১৯৪০ সালে আইনসটাইনের সাথে কথোপকথনের একটি ঘটনা উল্লেখ করেন। গ্যামো খুব হাল্কা চালে সেদিন আইনসটাইনকে বলেছিলেন, 'আমার এক ছাত্র সেদিন আপনার সমীকরন গুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে দেখলো যে একটি নক্ষত্র কিন্তু স্রেফ শূন্য থেকে উদ্ভুত হতে পারে, কারণ আপনার সমীকরনে ঋণাত্মক মাধ্যাকর্ষন শক্তি ধণাত্মক ভর-শক্তিকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়।' শুনে আইনসটাইন একটু থমকে দাড়ালেন। গ্যামো বললেন, 'আমরা ওই সময় দুজনে রাস্তা পার হচ্ছিলাম, আর এত গাড়ি ঘোড়ার ভীরে আমাদের কথা শেষ পর্যন্ত হারিয়ে গেল' ।

আমরা জানি পদার্থের ভর এবং শক্তি সম্পর্কিত হয় আইনসটাইনের বিখ্যাত সমীকরণ $E=mc^2$ দিয়ে। যদি পর্যাপ্ত শক্তি বিদ্যমান থাকে, ফোটন থেকে যে কোন সময় পদার্থ-প্রতি পদার্থ যুগল তৈরী হতে পারে। এর নাম 'যুগল উৎপাদন' (pair production) এবং এই ব্যাপারটিই মহাবিশ্বের ভর সৃষ্টির জন্য দায়ী।

ট্রায়নের ধারণা অনুযায়ী আমাদের এই মহাবিশ্বের উদ্ভব হয়েছে শূন্যাবস্থা থেকে বড় সড় এক ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশনের মধ্য দিয়ে। আসলে কোয়ান্টাম তত্ত্বানুযায়ী শূন্যতাকে আনেক তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হয়। শূন্যতা মানে আক্ষরিক অর্থে শূন্য নয়- পদার্থ বিজ্ঞানীদের মতে যে শূন্যদেশকে আপাতঃ দৃষ্টিতে শান্ত, সমাহিত মনে হচ্ছে, তার সূক্ষস্তরে সবসময়ই নানান প্রক্রিয়া ঘটে চলেছে। এর মধ্যে নিহিত শক্তি থেকে পদার্থকণা স্বতঃস্ফুর্তভাবে তৈরী হচ্ছে, আবার তারা নিজেকে সেই শক্তিতে বিলীন করে দিচ্ছে। যেমন, শূন্যাবস্থা থেকে সামান্য সময়ের ঝলকানির মধ্যে ইলেকটন এবং পজিটন (পদার্থ-প্রতি পদার্থ যুগল) থেকে পদার্থ তৈরী হয়েই আবার তা শূন্যতায় মিলিয়ে যেতে পারে। পুরো ব্যাপারটার স্থায়ীত্বকাল

মাত্র 10^{-21} সেকেন্ড। ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশন পঙ্খীরাজ ঘোড়ার মত কোন রূপকথার জীব নয়, নয় কোন গানিতিক বিমূর্ত মতবাদ; বিজ্ঞানীরা কিন্তু ব্যবহারিকভাবেই এর প্রমাণ পেয়েছেন*।

রিচার্ড মরিসের ভাষায়,

> 'আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে 'শূন্যতা' বলে আসলে কিছু নেই। এমনকি সত্যিকার ভ্যাকুয়ামেও প্রতিনিয়ত ভার্চুয়াল কণিকার যুগল ক্রমাগত উদ্ভুত হচ্ছে, আবার বিনাশপ্রাপ্ত হচ্ছে। এই সব ভার্চুয়াল কণিকার অস্তিত্ব কোন গানিতিক কল্পণা নয়। যদিও আমরা এগুলোকে চোখে দেখি না, কিন্তু এগুলোর প্রভাব খুবই স্পষ্ট। এগুলোর অস্তিত্ব যে আছে, এই ভবিষ্যৎবানী পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে খুব নিখুঁত ভাবেই প্রমাণিত হয়েছে' (Richard Morris, The Edges of Science. New York: Prentice Hall., 1990, p25)

তবে ট্রায়ন প্রথমে যে ভাবে ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশনের মধ্য দিয়ে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে বলে ধারণা করেছিলেন, তাতে বেশ কিছু সমস্যা ছিল। প্রথমতঃ এই প্রক্রিয়ায় ১৫০০ কোটি বছর আগেকার পৃথিবীর উদ্ভবের সম্ভাবনাটি খুবই কম। আর দ্বিতীয়তঃ এই মহাবিশ্ব যদি শূন্যাবস্থা (empty space) থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে প্রশ্ন থেকে যায়- আদিতে সেই শূন্যাবস্থা (space)ই বা এলো কোথা থেকে (পাঠকদের এ প্রসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুযায়ী, স্পেস কে কিন্তু দেশ কালের বক্রতার পরিমাপে প্রকাশ করা হয়)? ১৯৮২ সালে আলেকজান্দার ভিলেঙ্কিন (Alexander Vilenkin) এর একটি সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করেন এভাবে - মহাবিশ্ব সৃষ্ট হয়েছে কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের মধ্য দিয়ে আক্ষরিক অর্থেই 'শূন্য' থেকে - তবে এই শূন্যাবস্থা শুধু 'পদার্থবিহীন' শূন্যাবস্থা নয়, বরং সেইসাথে সময়শূন্যতা এবং স্থানশূন্যতাও বটে। ভিলেঙ্কিন কোয়ান্টাম টানেলিং এর ধারণাকে ট্রায়নের এর তত্ত্বের সাথে জুড়ে দিয়ে বললেন, এ মহাবিশ্ব যাত্রা শুরু করেছে এক শূন্য জ্যামিতি (empty geometry) থেকে এবং কোয়ান্টাম টানেলিং এর মধ্য দিয়ে উত্তোরিত হয়েছে অশূন্য আবস্থায় (non-empty state) আর অবশেষে ইনফ্লেশনের মধ্য দিয়ে বেলুনের মত আকারে বেড়ে আজকের অবস্থানে এসে দাড়িয়েছে।

ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে শূন্য অবস্থা থেকে কিভাবে আমাদের এ মহাবিশের উদ্ভব আর বিস্তার ঘটতে পারে তা সাধারণ পাঠকদের জন্য তুলে ধরেছেন স্টিফেন হকিং তার বিখ্যাত '*দি ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম*' গ্রন্থে :

---

* 'কাসিমির এফেকট' - ১৯৪৮ সালে ডাচ পদার্থবিদ হেনরিখ কাসিমিরের ভবিষ্যদ্বানী, যা পরবর্তীতে মার্কস স্প্যার্ণে, স্টিভ লেমোরাক্স প্রমুখ বিজ্ঞানীদের পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়।

> There are something like ten million million million million million million million million million million million million million million million million (1 with eighty zeroes after it) particles in the region of the universe that we can observe. Where did they all come from? The answer is that, in quantum theory, particles can be created out of energy in the form of particle/antiparticle pairs. But that just raises the question of where the energy came from. The answer is that the total energy of the universe is exactly zero. The matter in the universe is made out of positive energy. However, the matter is all attracting itself by gravity. Two pieces of matter that are close to each other have less energy than the same two pieces a long way apart, because you have to expend energy to separate them against the gravitational force that is pulling them together. Thus, in a sense, the gravitational field has negative energy. In the case of a universe that is approximately uniform in space, one can show that this negative gravitational energy exactly cancels the positive energy represented by the matter. So the total energy of the universe is zero. (*Stephen W. Hawking, A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes, New York: Bantam, 1988, p. 129.*)

আসলে ১৯৮১ সালে মহাজাগতিক স্ফীতি তত্ত্বের (cosmic inflation) আবির্ভাবের পর থেকেই বহু তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী প্রাথমিক কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের মাধ্যমে মহাজাগতিক স্ফীতিকে সমন্বিত করে তাদের মডেল বা প্রতিরূপ নির্মাণ করেছেন। বহু বৈজ্ঞানিক জার্নালে সেগুলো প্রকাশিতও হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে এখানে কিছু পেপারের উল্লেখ করা যেতে পারে :David Atkatz and Heinz Pagels, "Origin of universe as Quantum Tunneling effect" Physical review D25 (1982): 2065-73; S.W. Hawking and I.G.Moss "Supercolled Phase Transitions in the very early Universe", Physics letters B110(1982):35-38; Alexander Vilenkin, "Creation of Universe from Nothing" Physics letters 117B (1982) 25-28, Andre Linde, "Quantum creation of the inflamatory Universe," Letter Al Nuovo Cimento 39(1984): 401-405 ইত্যাদি। সাধারণ পাঠকদের জন্য পেপারগুলো অতিরিক্ত প্রায়োগিক এবং জটিল মনে হতে পারে[†], কিন্তু এখানে এই ব্যাপারটির উল্লেখ এ কারণেই করা হল, যাতে বুঝতে সুবিধা হয় যে, বহু বিখ্যাত পদার্থবিদই আজ স্রেফ শুন্যাবস্থা থেকে স্বতস্ফুর্তভাবে বিশ্বব্রহ্মান্ডের উৎপাত্তির সম্ভাব্যতার এই বৈজ্ঞানিক ধারণাটির উপর জোর নজর দিচ্ছেন, হাস্যকর বা 'ননসেন্স' ভেবে কেউ উড়িয়ে দিচ্ছেন না। ধারণাটি যদি স্রেফ 'ননসেন্স'ই হত, তবে বৈজ্ঞানিক জার্ণালগুলোতে এই ধারণার উপর আলোকপাত করা পেপারগুলো সাম্প্রতিক সময়ে কখনই প্রকাশিত হত না।

[†] অপেক্ষাকৃত সহজ ভাষায় লেখা জনপ্রিয় ধারার প্রবন্ধের জন্য Halliwell, Jonathan J. "Quantum Cosmology and the Creation of the Universe." Scientific American 265 (December 1991): 76. দেখুন।

ভিকটর স্টেংগর পেশায় ইউনিভার্সিটি অব হাওয়াইয়ের 'ফিসিক্স এবং অ্যাস্ট্রোনমি' বিভাগের Emeritus Professor এবং কলোরাডো ইউনিভার্সিটির দর্শনের Adjunct Professor. তিনি 'কলোরাডো সিটিজেন অব সায়েন্স' এরও প্রেসিডেন্ট আর নেশায় যুক্তিবাদী। তিনি আমাদের মুক্তমনা ফোরামের একজন সম্মানিত সদস্য। তার '***Has Science Found God?*** *The Latest Results in the Search for Purpose in the Universe*' সাম্প্রতিক সময়ের অত্যন্ত আলোড়ন তোলা বই। তিনি বইটির 'The Uncreated Universe' অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন পদার্থবিজ্ঞানের নিত্যতার সূত্র লংঘন না করেই কিভাবে শূন্য থেকে বিশ্বজগৎ সষ্টি হতে পারে; এবং এর মধ্যে 'অলৌকিকত্ব' কিছু নেই। তার ভাষায়-

> '...In other words, NO energy from the outside was required to "create" the universe. What is more, this is also a prediction of inflationary cosmology, which we have seen has now been strongly supported by observations. Thus we can safely say, **No violation of energy** conservation occurred if the universe grew out of an initial void of zero energy.'

এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, শূন্য থেকে ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশনের মাধ্যমে এই মহাবিশ্ব তৈরী হয়েছেই - এটা কিন্তু আমি হলফ করে বলছি না। মানে, আমি কোন তত্ত্ব পাঠকদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছি না এখানে। যেটা বলতে চাইছি তা হল এই প্রক্রিয়ায় মহাবিশ্ব সৃষ্টি 'হতে পারে', এবং এটি সাম্প্রতিক গবেষনার মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞানের সাথে মোটেই অসঙ্গতিপূর্ণ নয়। তবে শেষ কথা বলবার সময় এখনই আসে নি। শেষ কথা বলতে পারে বিজ্ঞান। শেষ কথা জানতে চাইলে আমাদের বিজ্ঞানের অগ্রগতির দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া এ মুহূর্তে গত্যান্তর নেই।

অতি সম্প্রতি বিশ্বাসীদের পক্ষ থেকে নতুন কিছু যুক্তির অবতারনা করে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে । তার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় যেটি হল : সৃষ্টির বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্প (Intelligent Design argument)। এটি মূলতঃ পিলের ডিজাইন আর্গুমেন্টেরই বর্ধিত রূপ। মাইকেল বিহে, উইলিয়াম ডেম্বস্কি, জর্জ এলিস প্রমুখ এ তত্ত্বটির প্রবক্তা। এঁদের যুক্তি হল, আমাদের বিশ্বব্রহ্মান্ড এমন কিছু চলক বা ভ্যারিয়েবলের সূক্ষ্ম সমন্বয়ের (Fine Tuning) সাহায্যে তৈরী হয়েছে যে এর একচুল হের ফের হলে আর আমাদের এ পৃথিবীতে কখনই প্রাণ সৃষ্টি হত না। অর্থাৎ, পরবর্তীতে প্রাণ সৃষ্টি করবেন এই ইচ্ছাটি মাথায় রেখে ঈশ্বর বিশ্বব্রহ্মান্ড তৈরী করেছিলেন, আর সে জন্যই আমাদের মহাবিশ্ব ঠিক এরকম; এত নিখুঁত, এত সুসংবদ্ধ। ব্যাপারটা একটু ভালভাবে ব্যাখ্যা করা যাক। ধরা যাক মাধ্যাকর্ষনের কথা। নিউটন তার মাধ্যাকর্ষন সূত্রে একটি ধ্রুবক ব্যবহার করেছিলেন

যাকে আমরা বলি নিউটনীয় ধ্রুবক, বা গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট । নিউটন তার সেই বিখ্যাত সূত্রে দেখিয়েছিলেন, দুটো বস্তুর মধ্যে আকর্ষণবলের পরিমান ঠিক কতটা হবে সেটা নির্ণয়ে এই গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট নামের রাশিটি একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদি ওই ধ্রুবকটির মান এখন যা আছে তা না হয়ে অন্যরকম হত আকর্ষণ বলের পরিমাণও যেত বদলে। সাদা চোখে মনে হবে যে ব্যাপারটা সামান্যই, আকর্ষণ বল বদলালেও বোধ হয় তেমন কিছু যাবে আসবে না। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলেন, ওই ধ্রুবকের মান আসলে আমাদের এই পরিচিত বিশ্বব্রহ্মান্ডের প্রকৃতি নির্ধারণ করছে। ওটার মান এখন যা আছে তা না হয়ে যদি অন্য ধরণের কিছু হত তা হলে এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ডটাই হত অন্যরকম। ওই ধ্রুবকের মান ভিন্ন হলে তারাদের মধ্যে হাইড্রোজেন নিঃশেষিত হয়ে হিলিয়াম উৎপাদনের মাত্রাকে দিত বদলে। হাইড্রোজেন-হিলিয়ামের পর্যাপ্ততা শুধু এই গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট এর উপরই নয়, মহাকর্ষ এবং দুর্বল পারমানবিক বলের মধ্যকার শক্তির ভারসাম্যের উপরও অনেকাংশে নির্ভরশীল। যেমন, তারা দেখিয়েছেন, দুর্বল পারমানবিক বলের শক্তি যদি একটু বেশী হত, এই মহাবিশ্বে পুরোটাই মানে শতকরা একশ ভাগ হাইড্রোজেনে পূর্ণ থাকত, কারণ ডিউটেরিয়াম (এটি হাইড্রোজেনের একটি মাসতুত ভাই, যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে 'আইসোটোপ') আর হিলিয়ামে পরিণত হবার আগেই সমস্ত নিউট্রন নিঃশেষ হয়ে যেত। আবার দুর্বল পারমানবিক বলের শক্তিমত্তা আরেকটু কম হলে সারা মহাবিশ্বে শতকরা একশ ভাগই হত হিলিয়াম। কারণ সে ক্ষেত্রে নিউট্রন নিঃশেষিত না হয়ে তা উৎপন্ন প্রটোনের সাথে যোগ দিয়ে হাইড্রোজেন তৈরীতে বাঁধা দিত। কাজেই এ দু' চরম অবস্থার যে কোন একটি সঠিক হলে মহাবিশ্বে কোন নক্ষত্ররাজি তৈরী হওয়ার মত অবস্থাই কখনও তৈরী হত না, ঘটত না আমাদের এই মলয়শীতলা ধরনীতে কার্বন-ভিত্তিক প্রাণের নান্দনিক বিকাশ। আবার, বিজ্ঞানীরা ইলেকট্রনের ভর মাপতে গিয়ে দেখেছেন তা নিউট্রন-প্রোটনের ভরের পার্থক্যের চেয়ে কিছুটা কম যার ফলে তারা মনে করেন, একটি মুক্ত-নিউট্রন সহজেই প্রোটন, ইলেকট্রন ও অ্যান্টি-নিউট্রিনোতে পরিনত হতে পেরেছে। যদি ইলেকট্রনের ভর সামান্য বেশী হত, নিউট্রন তাহলে সুস্থিত হয়ে যেত, আর সৃষ্টির প্রারম্ভে উৎপান্ন সমস্ত ইলেকট্রন আর প্রোটন সব একসাথে মিলে-মিশে নিউট্রনে পরিনত হয়ে যেত। এর ফলে যেটা ঘটত সেটা আমাদের জন্য খুব একটা সুখপ্রদ কিছু নয়। সে ক্ষেত্রে খুব কম পরিমানে হাইড্রোজেনই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকত থাকত আর তা হলে নক্ষত্রের জন্য পর্যাপ্ত জ্বালানীই হয়ত খুঁজে পাওয়া যেত না। জন ডি. ব্যরো এবং ফ্রাঙ্ক জে. টিপলার এ ধরনের নানা ধরনের রহস্যময় 'যোগাযোগ' তুলে ধরে একটি বই লিখেছেন ১৯৮৬ সালে, নাম- 'The Anthropic Cosmological Principle'। তাঁদের বক্তব্য হল, আমাদের মহাবিশ্বে গ্র্যাভিটেশনাল অথবা কসমলজিকাল ধ্রুবকগুলোর মান এমন কেন, কিংবা মহাবিশ্বের চেহারাটাই বা এমন কেন হয়েছে তার উত্তর পেতে হলে ব্যাখ্যা খুঁজতে হবে পৃথিবীতে প্রাণ এবং মানুষের উপস্থিতির দিকে তাকিয়ে। পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টির জন্য সর্বোপরি

মানুষের আবির্ভাবের জন্য এই মৌলিক ধ্রুবক আর চলকগুলোর মান ঠিক এমনই হওয়া দরকার ছিল - সে জন্যই ওগুলো ওরকম। দৈবক্রমে ওগুলো ঘটে নি, ররং এর পেছনে (বিধাতার) একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে। মানুষকে কেন্দ্রে রেখে বিশ্বব্রহ্মান্ডের নিয়ম-নীতিগুলোকে ব্যাখ্যা করবার এই যুক্তিকে বলা হয় 'অ্যানথ্রোপিক আর্গুমেন্ট' বা 'নরত্ববাচক যুক্তি'।

এধরনের যুক্তিগুলো প্রথম দৃষ্টিতে খুব আকর্ষনীয় দেখালেও, অনুসন্ধিৎসু সংশয়বাদী চোখ দিয়ে দেখলে কিন্তু নানা দুর্বলতা প্রকাশ পায়। প্রথমতঃ এক্ষেত্রে ধরেই নেওয়া হয়েছে আমাদের পৃথিবীতে যে ভাবে কার্বন ভিত্তিক প্রাণের বিকাশ ঘটেছে সেভাবে ছাড়া আর অন্য কোনভাবে প্রাণ সৃষ্ট হতে পারবে না। যেমন, প্রায়ই আমরা শুনি যে, আমাদের পৃথিবীতে তাপ, চাপ সবকিছু যদি সঠিক অনুপাতে না থাকত, তবে প্রাণের বিকাশ ঘটত না। এই যে পৃথিবীটা ২৩.৫ ডিগ্রীতে হেলে আছে, তার এক চুল এদিক ওদিক হলে তাপ আর চাপের এমন বৈষম্য তৈরী হত যে, প্রাণ সৃষ্টিই অসম্ভব একটি ব্যাপারে পরিণত হত। কিন্তু অনেকেই প্রাণের এই ধরনের 'সঙ্কীর্ণ' সংজ্ঞার সাথে একমত পোষণ করেন না। তারা বলেন, আমরা ওই ধরণের 'সর্বোত্তম' পরিবেশে বিকশিত হয়েছি বলে আমরা মনে করি প্রাণের উৎপত্তির জন্য ঠিক ওধরণের পরিবেশই লাগবে। যেমন, বাতাসে সঠিক অনুপাতে অক্সিজেন, চাপ, তাপ ইত্যাদি। এগুলো ঠিক ঠিক অনুপাতে না থাকলে নাকি জীবনের বিকাশ ঘটবে না। এটি একটি সজ্ঞাত ধারণা, প্রামাণিত সত্য নয়। অক্সিজেনকে জীবন বিকাশের অন্যতম উপাদান বলে মনে করা হয়, কিন্তু মাটির নীচে এমন অনেক ব্যাকটেরিয়ার সন্ধান পাওয়া গেছে যাদের জন্য অক্সিজেন শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয়, রীতিমত ক্ষতিকর। সমুদ্রের গভীর তলদেশে এমনকি কেরসিন তেলের ভিতরের বৈরী পরিবেশেও প্রাণের বিকাশ ঘটেছে এমন প্রমাণ বিজ্ঞানীদের কাছে আছে যে ধরনের পরিবেশের সাথে আসলে আমাদের সংজ্ঞায়িত 'সর্বোত্তম পরিবেশের' কোনই মিল নেই। কাজেই হলফ করে বলা যায় না যে, মহাজাগতিক ধ্রুবক আর চলকগুলোর মান অন্যরকম হলে এই মহাবিশ্বে প্রাণের বিকাশ ঘটত না। আমাদের মুক্ত-মনা সদস্য এবং বিখ্যাত জ্যোতির্পদার্থবিদ ভিকটর স্টেংগর তার 'The Unconscious Quantum: Metaphysics in Modern Physics and Cosmology' বইয়ে দেখিয়েছেন চলক আর ধ্রুবকগুলোর মান পরিবর্তন করে আমাদের বিশ্বব্রহ্মান্ডের মতই অসংখ্য বিশ্বব্রহ্মান্ড তৈরী করা যায়, যেখানে প্রাণের উদ্ভবের মত পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে। এর জন্য কোন সুক্ষ্ম সমন্বয় বা 'ফাইন টিউনিং' এর কোন প্রয়োজন নেই। এই ব্যাপারটি বোঝানোর জন্য তিনি 'মাঙ্কি গড' নামের একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম লিখেছেন যার প্যারামিটারগুলোতে নির্বিচারে মান বসিয়ে সেই তথাকথিত 'অ্যানথ্রোপিক কোইন্সিডেন্স' ঘটানো যায়, ঈশ্বরের হাত ছাড়াই। 'মাঙ্কি গড' শুনতে খেলো শোনালেও এটি কোন ছেলে খেলা নয়, বরং রিচার্ড ক্যারিয়ারের ভাষায়, একটি 'সিরিয়াস রিসার্চ প্রোডাক্ট' যা *Philo*, 3:2 (Fall-Winter 2000) জার্নালে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রকাশিত হয়েছে। আমি নিজেও ডঃ

স্টেংগরের এই প্রোগ্রামটি তাঁর ওয়েবসাইট থেকে বহুবার ব্যবহার করেছি। কাজেই ডঃ স্টেংগর যখন বলেন, 'Fine Tuners have no basis in current knowledge for assuming that life is impossible except for a very narrow, improbable range of parameters' তখন সেটিকে গুরুত্ব না দিয়ে আমাদের উপায় থাকে না।

'ফাইন টিউনিং' আর্গুমেনটের এর সমালোচনা করেছেন নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী স্টিভেন ওয়েইনবার্গও। তিনি 'A Designer Universe? ' প্রবন্ধে এ ধরনের যুক্তির সমালোচনা করে বলেন :

> 'কোন কোন পদার্থবিদ আছেন যারা বলেন প্রকৃতির কিছু ধ্রুবকের মানগুলোর এমন কিছু মানের সাথে খুব রহস্যময়ভাবে সূক্ষ-সমন্বয় (fine-tune) ঘটেছে যেগুলো জীবন গঠনের সম্ভাব্যতা প্রদান করে। এ ভাবে একজন মানব দরদী সৃষ্টিকর্তাকে কল্পণা করে বিজ্ঞানের সব রহস্য ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়। আমি এই ধরনের সুক্ষ্ম-সমন্বয়ের ধারণায় মোটেও সন্তুষ্ট নই।' তিনি কার্বন তৈরীর পেছনে 'অ্যানথ্রোপিক আর্গুমেন্ট' এর চেয়ে পদার্থবিজ্ঞানের ব্যাখ্যাই বেশী গ্রহণযোগ্য মনে করেন।

সৃষ্টির বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্পটি শুধু জ্যোতির্বিদ্যায় নয়, খুব উচ্ছ্বাসের সাথে ইদানিং ব্যবহার করা হয় জীববিজ্ঞানেও। কিন্তু মজার ব্যাপার হল জীববিজ্ঞানের 'ফাইন টিউনার'রা যে ভাবে যুক্তি সাজিয়ে থাকেন, জ্যোতির্বিজ্ঞানের 'ফাইন টিউনার'রা দেন ঠিক উলটো যুক্তি। জীববিজ্ঞানের 'ফাইন টিউনার'রা বলেন আমাদের বিশ্বব্রহ্মান্ড প্রাণ সৃষ্টির পক্ষে এতটাই **অনুপযুক্ত** যে প্রাকৃতিক নিয়মে এখানে এমনি এমনি প্রাণ সৃষ্টি হতে পারে না। আবার জ্যোর্তিবিজ্ঞানের 'ফাইন টিউনার' রা উলটো ভাবে বলেন, এই বিশ্বব্রহ্মান্ড প্রাণ সৃষ্টির পক্ষে এতটাই **উপযুক্ত** যে এই বিশ্বব্রহ্মান্ড প্রাকৃতিক নিয়মে কোনভাবে সৃষ্টি হতে পারে না। একসাথে দুই বিপরীতধর্মী কথা তো সত্য হতে পারে না। আসলে মাইকেল আইকেদা, বিল জেফ্রিস, ভিক স্টেংগর, রিচার্ড ডকিন্স সহ অনেক বিজ্ঞানীই মনে করেন এই 'ফাইন টিউনিং' বা 'এনথ্রোপিক' আর্গুমেন্টগুলো সেই পুরোন 'গড ইন গ্যাপস' আর্গুমেন্টেরই নয়া সংস্করণ। যেখানে রহস্য পাওয়া যাচ্ছে, কিংবা আধুনিক বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে কিছু ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না, সেখানেই ঈশ্বরকে আমদানী করে একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করানো হচ্ছে। এভাবে মুক্ত-বুদ্ধি এবং বিজ্ঞান চর্চাকে উৎসাহিত না করে বরং অন্ধ বিশ্বাসের কাছে প্রকারন্তরে নতি স্বীকারে আমাদেরকে বাধ্য করা হচ্ছে। সেজন্যই রিচার্ড ডকিন্স তার 'The "know-nothings", the "know-alls", and the "no-contests"' প্রবন্ধে বলেন,

> 'Science offers us an explanation of how complexity (the difficult) arose out of simplicity (the easy). The hypothesis of God offers no worthwhile explanation for anything, for it simply postulates what we are trying to explain.'

আসলে অনেক বিজ্ঞানীই আজ এই মতের সাথে পুরোপুরি আস্থাশীল যে, মহাবিশ্ব মোটেও আমাদের জন্য 'ফাইন টিউনড' নয়, বরং আমরাই এই বিশ্বব্রহ্মান্ডে টিকে থাকার সংগ্রামে ধীরে ধীরে নিজেদেরকে 'ফাইন টিউন্ড' করে গড়ে নিয়েছি- 'The universe is not fine-tuned for humanity; Humanity is fine-tuned to the Universe'। ব্যাপারটা হয়ত মিথ্যে নয়। আমদের চোখের কথাই ধরা যাক। মানুষের চোখ বিবর্তিত হয়েছে এমনভাবে যে, এটি লাল থেকে বেগুনি পর্যন্ত -এই সীমার তড়িচ্চুম্বক বর্ণালিতেই কেবল সংবেদনশীল। এর কারণ হল, আমাদের বায়ুমন্ডল ভেদ করে এই সীমার আলোই বছরের পর বছর ধরে পৃথিবীতে এসে পৌঁছুচ্ছে। কাজেই সেই অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে আমাদের চোখও সেভাবেই বিবর্তিত হয়েছে। এখন এই পুরো ব্যাপারটিকে কেউ উলটোওভাবেও ব্যাখ্যা করতে চাইতে পারেন। বলতে পারেন যে, ঈশ্বর আমাদের চোখকে কে লাল থেকে বেগুনী আলোর সীমায় সংবেদনশীল করে গড়বেন বলেই বায়ুমন্ডলের মাধ্যমে তিনি সেই সীমার মধ্যবর্তী পরিসরের আলো আমাদের চোখে প্রবেশ করতে দেন। তাই আমাদের চোখ এরকম। কিন্তু এভাবে ব্যাখ্যা করাটা কতটা যৌক্তিক? অনেকটা ঘোড়ার আগে গাড়ী জুড়ে দেওয়ার মতনই শোনায়। তারপরও 'ফাইন টিউনার'রা ঠিক এভাবেই যুক্তি দিতে পছন্দ করেন। মহাজাগতিক ধ্রুবকগুলোর মান এরকম কেন, বৈজ্ঞানিকভাবে এটি না খুঁজে এর ব্যাখ্যা হিসেবে 'না হলে পরে পৃথিবীতে প্রাণের আর মানুষের আবির্ভাব ঘটত না' এই ধরণের যুক্তি হাজির করেন। প্রাণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যই যদি মূখ্য হয়, তবে মহাবিস্ফোরনের পর ঈশ্বর কেন ৭০০ কোটি বছর লাগিয়েছিলেন এই পৃথিবী তৈরী করতে, আর তারপর আরো ৬০০ কোটি বছর লাগিয়েছিলেন 'মানবতার উন্মেষ' ঘটাতে তার কোন যৌক্তিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না । পৃথিবী সৃষ্টির ইতিহাসের পরিক্রমায় আমরা আজ জানি, মানুষ তো পুরো সময়ের একশ ভাগের এক ভাগেরও কম সময় ধরে পৃথিবীতে রাজত্ব করছে। তারপরও মানুষকে এত বড় করে তুলে ধরে মহাবিশ্বকে ব্যাখ্যা করার কি প্রয়োজন?

আসলে 'ঈশ্বর নির্ধারিত মানবকেন্দ্রিক' সংস্কারের ভুত মনে হয় কারো কারো মাথা থেকে যাচ্ছেই না। সেই টলেমীর সময় থেকেই আমরা তা দেখে এসেছি। আমাদের এই পৃথিবীটা যে মহাকাশের কোটি কোটি গ্রহ-নক্ষত্রের ভীরে হারিয়ে যাওয়া একটা নিতান্ত সাধারণ গ্রহ মাত্র, -এটি যে কোন কিছুরই কেন্দ্রে নয় - না সৌরজগতের, না এই বিশাল মহাবিশ্বের - এ সত্যটি গ্রহণ করতে মানুষের অনেকটা সময় লেগেছে। পৃথিবীকে সৌরজগতের কেন্দ্র থেকে সরিয়ে দিলে এর বিশিষ্টতা ক্ষুন্ন হয় এই ভয়েই বোধ হয় টলেমীর 'ভূ-কেন্দ্রিক' মডেল জনমানসে রাজত্ব করেছে প্রায় দু'হাজার বছর ধরে, আর ধর্ম বিরোধী সত্য উচ্চারণের জন্য কোপার্নিকাস, ব্রুনো, গ্যালিলিওদের সইতে হয়েছে নির্যাতন। একই দৃষ্টিভঙ্গি আমরা দেখেছি উনবিংশ শতাব্দীতে (১৮৫৯ সাল) যখন চার্লস ডারউইন এবং এ্যলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস প্রাকৃতিক নির্বাচনের (Natural Selection) মাধ্যমে জীবজগতের বিবর্তনের

প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। বিবর্তনের ধারণা সাধারণ মানুষ এখনও 'মন থেকে নিতে পারে নি' কারণ এই তত্ত্ব গ্রহণ করলে 'ঈশ্বরের অনুগ্রহপ্রাপ্ত' বিশেষ সৃষ্টি মানুষের বিশিষ্টতা ক্ষুন্ন হয়ে যায়! এই সংস্কারের ভুত এক-দু দিনে দূর হবার নয়। তাই রহস্য দেখলেই, জটিলতা দেখলেই মানুষ আজও নিজেকে সৃষ্টির মাঝখানে রেখে, পৃথিবীকে মহাবিশ্বের মাঝখানে বসিয়ে সমাধান খোঁজার চেষ্টা করে। 'ফাইন-টিউনিং', 'অ্যানথ্রোপিক' আর্গুমেন্টগুলো এজন্যই মানুষের কাছে এখনও এত আকর্ষনীয় বলে মনে হয়।

অনেকেই মনে করেন, মহাবিশ্ব সৃষ্টির পেছনে 'ঈশ্বরের অস্তিত্বের' বিশ্বাস-নির্ভর ধারণাটি একটি অপ্রয়োজনীয় ধারণা এবং এটি সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িতও নয় যে তা কোন ধরনের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা কখনও নির্নীত হওয়া সম্ভব। বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের তত্ত্বের সাফল্যজনক প্রয়োগেই মহাবিশ্বের সৃষ্টিরহস্য উদঘাটন করতে প্রয়াসী হয়েছেন, বহু ক্ষেত্রেই সন্তোষজনক ব্যাখ্যা নিয়ে হাজির হচ্ছেন। এভাবেই ধাপে ধাপে আমরা এগুচ্ছি। তার পরেও এটি অবশ্যই স্বীকার্য যে, আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেক জায়গাতেই এখনও 'ফাঁক' রয়ে গেছে; রয়ে গেছে অনেক দুর্জ্ঞেয় রহস্য। যেমন, আমরা এখনও জানি না পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলো কিভাবে একটা সময় তৈরী হল, জানি না দেড় হাজার কোটি বছর আগে মহাকাল ও মহাশূন্যের অস্তিত্ব ছিল কিনা, আমরা এখনো বুঝে উঠতে পারি নি সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রকৃতি কেন প্রতিকণিকার তুলনায় পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছিল কণিকাদের প্রতি, কৃষ্ণ-গহবরের কেন্দ্রে বা কি রয়েছে, কেনই বা মহাবিশ্ব ত্বরিত হচ্ছে, আমাদের বিশ্বব্রহ্মান্ডের মত কি আরো অসংখ্য মহাবিশ্বের অস্তিত্ব রয়েছে? - এ ধরণের নানা প্রশ্নের উত্তর। এধরনের প্রান্তিক প্রশ্নগুলো হয়ত সাময়িক সময়ের জন্য আমাদের চিন্তা চেতনাকে অনন্ত প্রহেলিকার মধ্যে নিয়ে যেতে চায়, কিন্তু বিজ্ঞানীরা জানেন কি করে প্রহেলিকা কাটাতে হয়, কিভাবে মানুষকে আলোকিত করে তুলতে হয়। যুগে যুগে আমরা তাই দেখে এসেছি। সেজন্যই তাঁরা আলোর প্রদীপ হাতে চলা আঁধারের যাত্রী। আমাদের মনে পশ্ন থেকে যাওয়া মানে ব্যর্থতা নয়, বরং এটি আমাদের অগ্রগামীতারই সূচক, জ্ঞানের পরবর্তী স্তরে উত্তরণের প্রেরণা।

আমি আমার এই প্রবন্ধটি শেষ করতে চাই একটি মজার ঘটনা উল্লেখ করে। এই ঘটনাটি আমি পড়েছিলাম বিখ্যাত জ্যোতির্পদার্থবিদ ডঃ মেঘনাদ সাহার 'হিন্দু ধর্ম-বেদ-বিজ্ঞান সম্পর্কিত চিত্তাকর্ষক বাদানুবাদ' থেকে। তার বর্ণিত ঘটনাটি এরকম :

বিখ্যাত গনিতজ্ঞ ল্যাপ্লাস তার সুবিখ্যাত 'Mechanique Celeste' গ্রন্থে গ্রহসমূহের এবং চন্দ্রের গতির খুব সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তিনি প্রমাণ করেন, গতিতত্ত্ব ও মাধ্যাকর্ষন দিয়ে পর্যবেক্ষিত সমস্ত গ্রহগতির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা হয়। তিনি যখন গ্রন্থটি নেপোলিয়ানকে উৎসর্গ করবার জন্য অনুমতি চাইতে গেলেন, তখন নেপোলিয়ান রহস্য করে বলেনঃ 'মসিয়ে ল্যাপ্লাস, আপনি আপনার বইয়ে বেশ ভালভাবেই মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের

চালচলন ব্যাখ্যা করেছেন; কিন্তু আমি দেখলাম আপনি সারা বইয়ে কোথাও ঈশ্বরের উল্লেখ করেননি। আপনার মডেলে ঈশ্বরের স্থান কোথায়?' ল্যাপ্লাস উত্তরে বলেন- 'Monseigneur, je n'avais pas besoin de tel hypthese' অর্থাৎ- 'Sire, I have no need of that hypothesis.' (এই অনুকল্পের কোন প্রয়োজন আমার কাছে নেই।)

এক নজরে আলো হাতে চলা আঁধারের যাত্রীরা

পাঠকের প্রতিক্রিয়া
Reader's Comment